ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য

অধ্যাপক
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী
৫নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক ঃ
এস, চক্রবর্ত্তী
প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী
৫নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ—১৩৬১ সন

মূল্য দুই টাকা বার আনা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীতড়িৎ চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রনাথ প্রেস
১৬৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

উপক্রম

ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয়ের, আত্ম-বিশ্লেষণের, আত্মোপলব্ধির যুগ। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহা এক গৌরবময় অধ্যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপ ধামে যে লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং যিনি ভাব ও প্রেমের বন্যায় সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই জঙ্গম হেমকল্পতরুর' কৃপাফল-বিতরণে ষোড়শ শতকের বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছিল। বাঙ্গালী লাভ করিয়াছিল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক নূতন ভাবদৃষ্টি,—মহাপ্রভুর দিব্য জীবন ও বাণীর উপর বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এক অভিনব দর্শন ও রসশাস্ত্র। বাংলার কাব্যকুঞ্জ হইয়াছিল অগণিত কোকিলের গুঞ্জরণে মুখরিত।

এই যুগের পদাবলী-সাহিত্য বাঙ্গালী-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। আবার এই যুগেই মঙ্গল-কাব্য সাহিত্যিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং একাধিক কবি ভারত-পাঁচালি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

'ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য' পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে, ইহা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের পরিপূরক গ্রন্থ। ইহাতে প্রধানত মধ্যযুগের বাঙ্গালীর নব-জন্ম-লাভের কথা আলোচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যকে শুধু সাহিত্যহিসাবে বিচার করিলে পদকর্ত্তাদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের লীলার প্রত্যক্ষদর্শী মহাজন, তাঁহাদের পদ-রচনার ধারা সাধনার ধারা হইতেই উৎসারিত হইয়াছিল। তাই চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-

সাহিত্যের আলোচনায় ভাগবত-ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্ব এবং প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা অপরিহার্য্য। এই জন্য 'ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে' এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পাইয়াছে। মধ্যযুগের চরিত-সাহিত্য সম্পর্কেও নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ এই পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সকলেই জানেন, ভারতবর্ষের সাধানায় অধিকারবাদ স্বীকৃত। স্বয়ং মহাপ্রভু এই অধিকারবাদকে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। অনধিকারী আমরা বৈষ্ণব সাহিত্য-সিন্ধুর উপকূলে দাঁড়াইয়া উপল-খণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র; কেননা, সাধনা-লব্ধ কোন অনুভূতি আমাদের নাই। কিন্তু শ্রদ্ধা-বুদ্ধির অভাবে আমরা সেই উপলখণ্ডেরও যথার্থ মূল্য নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল্য-বিচারে সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতা যেমন গর্হিত, শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাবও তেমনই নিন্দার্হ।

বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও ঐতিহের ধারার সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ ছিন্ন হইয়াছে বলিয়াই আমরা জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজনগণের পদাবলীর আলোচনায় ভ্রমে পতিত হইতেছি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অন্যান্য সাধনার ন্যায় বৈষ্ণব সাধনারও লক্ষ্য রূপান্তর, আর সাধনার অর্থ নিত্যসিদ্ধ ভাবসমূহের উদ্দীপন।

আমি পণ্ডিত বা সাধক নহি, তথাপি যথাসম্ভব শ্রদ্ধাবুদ্ধি লইয়া পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতির ন্যায় বড়ু চণ্ডীদাসকে আমি মহাজন আখ্যা দিতে পারি নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বত্র যুক্তিযুক্ত

অথবা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি সর্ব্বত্র উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে করি নাই।

কোন বিষয়ে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে সংস্কার-মুক্ত মন লইয়া উভয় পক্ষের বক্তব্য পর্য্যালোচনা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। যাঁহারা বসন্ত বাবুর বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁহাদের মধ্যে তিনজনের নাম স্মরণীয়।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। মনীষী ও মনস্বী লেখক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, এই গ্রন্থে নানা যুগের নানা কবির রচনা স্থান পাইয়াছে। যিনি নিরপেক্ষ ভাবে কাব্যখানি পাঠ করিবেন, তিনিই যোগেশ বাবুর মতের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করিবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'সভাপতি' কথাটির যে প্রয়োগ রহিয়াছে, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল মহাশয়।

দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ মহাশয়ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্পর্কে বসন্ত বাবুর দাবী সমূহকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার কৃত টীকাকেও সর্ব্বত্র নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। দক্ষিণা বাবুর ভাষায় কিছু উগ্রতা থাকিলেও তাঁহার যুক্তি যে সর্ব্বত্র উপেক্ষণীয় নহে, একথা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

আমি প্রধানত প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব ঐতিহ্যের দিক্ হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আলোচনা করিয়া ইহাতে 'রসাভাস-দোষ'ও 'সিদ্ধান্ত-বিরোধ' প্রদর্শন করিয়াছি। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র যে ষোড়শ শতাব্দী অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এ কথাও বিস্মৃত হই নাই।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি।

গ্রন্থের প্রথম দুইটি প্রবন্ধ যথাক্রমে 'শনিবারের চিঠি ও 'গল্পভারতীতে' মুদ্রিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট নিবন্ধগুলি নূতন লিখিত।

শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণে গ্রন্থের মধ্যে কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। কোন কোন উক্তি সম্পর্কে মতবিরোধেরও অবকাশ আছে। সহৃদয় পাঠক আমার দোষত্রুটিগুলি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখিলে বা কোন ভ্রম-প্রমাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

দোল পূর্ণিমা
১৩৬১ বঙ্গাব্দ

বিনয়াবনত
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সূচীপত্র

বাংলার নব-জন্ম

নিদাঘের খরতাপে দগ্ধ, শুষ্ক, দীর্ণ পৃথিবীর বুকে যেমন বর্ষার প্লাবন নামিয়া আসে, তেমনি যোড়শ শতাব্দীর শাস্ত্র-শাসিত, আচারের বন্ধনে জর্জ্জরিত বাংলাদেশে যে মহাভাবের প্লাবন নামিয়া আসিয়া একদিন সমগ্র ভারতভূমিকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, তাহার উৎসমুখে ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবন ও অলৌকিক লীলা। সেদিন বাঙ্গালী মনীষার এক অভূতপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর জাগরণ ঘটিয়াছিল, সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধির সঙ্গে শাস্ত্র-জ্ঞান ও অলৌকিক রসানুভূতির এক মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিয়াছিল বাঙ্গালীর জীবনে ; বাঙ্গালী লাভ করিয়াছিল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচার করিয়াছিল ভাগবতের অনুগামিনী ব্রহ্মসূত্রের এক নূতন ব্যাখ্যা ; অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের বিশ্লেষণেও সে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিল। সেদিন বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম চরিত-সাহিত্য জন্ম লাভ করিয়াছিল, দেবতার প্রসাদ-ভিক্ষু মানুষ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলার উপরে মাধুর্য্য-লীলা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া পদাবলী-সাহিত্যে শান্ত ও দাস্য রস স্থান লাভ করে নাই ; কারণ, মহাপ্রভু স্বয়ং সনাতনকে বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ'।

সেদিন প্রাদেশিক সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যের শীর্ণ প্রবাহিণী অকস্মাৎ প্রাণবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবত, নিখিল ভারতে মহাপ্রভুর ভাবাদর্শ ও অলৌকিক লীলা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই সেদিন বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষায় কাব্য, নাটক, অলঙ্কার-শাস্ত্র, গদ্যনিবন্ধ প্রভৃতি রচনা করিয়া সংস্কৃতের মরা গাঙ্গে জোয়ার বহাইয়া দিয়াছিলেন। পরববর্ত্তী কালে এই একই প্রবৃত্তি হইতে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর বিদ্যাপতির পদাবলীর ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

গীতায় ভগবান যে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের কথা বলিয়াছেন, তথ্যদর্শী ঐতিহাসিকের নিকট সে কথার একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। কোন জাতির জীবন সময়ে সময়ে অবসাদে আচ্ছন্ন, নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়ে, জাতির প্রাণ-শক্তি সুপ্তির জড়িমায় স্তিমিত, নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। জাতি তখন তাহার স্বধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে স্খলিত হয়। জাতির জীবনের এই বিপর্য্যয়, এই প্রমাদ, এই লক্ষ্যভ্রংশের নামই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। এই সময়ে, দেশের স্বল্পসংখ্যক মনস্বী ও হৃদয়বান্ পুরুষ অন্তরে যে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গোপনে লালন করেন, যে বেদনায় তাহাদের মর্ম্ম ভেদ করিয়া ক্রন্দন ধ্বনিত হয়, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা যাঁহার মধ্যে সংহত হয়, তাঁহাকেই আমরা মহাপুরুষ বা লোকোত্তর পুরুষ বা অবতার বলিয়া পূজা করি। ভারতবাসী যখন উপনিষদের ঋষির অধ্যাত্ম-সাধনার কথা বিস্মৃত হইয়া ভোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বর্গ-লাভের আশায়

মূক, অসহায় পশুর শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া নানারূপ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিল, ভারতের প্রাণপুরুষ যখন সুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ; ভারতের মননশীলতা ও হৃদয়বত্তা পর্য্যন্ত যেদিন স্তব্ধ, সেদিন কি ভারতে সত্যই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় নাই ? এই ক্রিয়াবিশেষবহুল ধর্ম্মের প্রতি শাক্য-সিংহের পূর্ব্বে ও তাঁহার সমকালে যে বিদ্রোহের বহ্নি কোন কোন মনীষীর মনে ধূমায়িত হইয়াছিল, সেই বহ্নিরই দীপ্যমান রূপ আমরা দেখিতে পাই ভগবান তথাগতের মধ্যে। আবার তুর্কী অভিযানে যখন বাংলার প্রাণপুরুষ স্তব্ধ, অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, তুর্কীর সামরিক শক্তির প্রবল আঘাতে বাঙ্গালী যখন আপন ধর্ম্ম ও আচার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে পারিতেছিল না, সমাজপতিগণ যখন 'তথাকথিত' উচ্চ বর্ণকে কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া স্বধর্ম্মরক্ষার নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন সত্যই বাংলায় ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর জীবন সেদিন উদ্যমহীন, উৎসাহশূন্য ; 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' লইয়া সে কোনমতে জীবিত, তাহার প্রতিভা-সূর্য্য সেদিন নিবিড় জলদে অবলুপ্ত। তারপর দীর্ঘ তামসী রজনীর অবসানের পর বাংলায় আলোকের বন্যা নামিয়া আসিল। কিন্তু ইহাও নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা নহে। মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালে যদিও নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম্ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার পূজা প্রভৃতিই ধর্ম্মোৎসব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, 'যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত' সকলের মনে আনন্দ পরিবেশন করিত, তথাপি তখনও ভক্ত বৈষ্ণবের একেবারে অসদ্ভাব

ঘটে নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের কাতর প্রার্থনা ও হুঙ্কারেই ক্ষীরোদ-সাগর-শায়ী নারায়ণের নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য ভিন্নও গোপীনাথ, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণ বিষ্ণুর স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন প্রভৃতিতে কালযাপন করিতেন। এই সকল আচার্য্যগণের মধ্যে যে ভক্তি-ধর্ম্মের বীজ সহজে অঙ্কুরিত, মহাপ্রভুতে উহাই পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়া আকাশের পানে উন্মুখ হইয়াছিল এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধিয়াছিল।

ভগবান তথাগত একদিন মানুষকে মহত্তম মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই যে নির্ব্বাণ-লাভের অধিকারী, এ কথা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছেন,—আত্ম-দীপ হইয়া বিহার কর, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর। প্রত্যেক মানুষ যে নিজের ভাগ্যবিধাতা, মানুষ যে স্বয়ং পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়, আবার নিজের চেষ্টায়ই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে পারে, একথা শাক্যমুনির মত এতটা জোরের সহিত আর কেহ প্রচার করেন নাই। উপালি ও অম্বপালিকে গৌরব দান করিয়া তিনি এই সত্যই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র ও সমাজের অনুশাসনের চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

শ্রীচৈতন্যদেবও মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস;' সুতরাং তিনিই ধন্য, যিনি কৃষ্ণের সেবায়

জীবন উৎসর্গ করেন। ভগবান কুলমর্য্যাদা, পাণ্ডিত্য, সম্পদ প্রভৃতি কিছুরই বিচার করেন না, তিনি একমাত্র ভক্তির বশীভূত। রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

মহাপ্রভু একথা শুধু তত্ত্ব হিসাবে প্রচার করেন নাই, তিনি দেশময় যে প্রেমের প্লাবন বহাইয়াছেন, তাহাতে জাতি-কুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃত-কার যবন হরিদাসকে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

'হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥
তাঁহার অনন্তগুণ—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জয় শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিলা চৈতন্য প্রভু মহা কুতূহলে'॥

হরিদাসের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

'জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে॥

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে'॥

(চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, দশম অধ্যায়)

মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—ভগবান বিভুচৈতন্য ও জীব অণুচৈতন্য। জীব ও ভগবানে যেমন ভেদের সম্পর্ক, তেমনই অভেদের সম্পর্কও রহিয়াছে। যিনি হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর, সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবনেই মানব-জীবনের সার্থকতা, আর এই সেবার মহৎ অধিকার মানুষমাত্রেরই রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্য মানুষকে একান্ত ভাবে দৈবাধীন করিয়াছে; তাই, অসহায় মানুষ সুখ ও সম্পদ লাভের আশায় দেবতার প্রসাদ-ভিক্ষা ও তাঁহার চরণে নতি স্বীকার করিয়াছে। মহাপ্রভু কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য-লীলা নয়, নর-লীলাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া, মানুষ ও ভগবানের ব্যবধান লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে দেশে যে ভক্তি-ধর্ম্মের একটা কূল-প্লাবী দুর্ব্বার বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, যে বন্যার জলে অবগাহন করিয়া অস্পৃশ্য, হীন ও পতিতেরাও ধন্য হইয়াছে—কোনরূপ শাস্ত্রীয় বা সামাজিক অনুশাসন উহাকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম যে অত্যল্প কালের মধ্যেই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার একটি প্রধান কারণ, এই ধর্ম্মরূপ মহাদ্রুমের সুশীতল ছায়ায় মানুষমাত্রেরই বিশ্রাম লাভের অধিকার ছিল। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব আচার্য্যগণ আচরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারকেও

তাঁহাদের জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, যে ভক্তি-ধর্ম্ম জীবের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই ভক্তিধর্ম্মকে মহাপ্রভু মানুষের পক্ষে একমাত্র সাধ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; —সনাতন গোস্বামীকে তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন,—জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। শুধু তাহাই নহে, সঙ্ঘবদ্ধ মধুর-তান-লয়-সমন্বিত সংকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই ধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে মানুষ স্বভাবতই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর সর্ব্বোপরি ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের দিব্য জীবনের আদর্শ।

মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া করুণাসিন্ধু শ্রীমন্নিত্যানন্দ গৌড়দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, আর তাঁহার প্রচারের ফলেই গৌড়ভূমি নাম-সংকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, শাশ্বতকালের মানুষের কাছে উহার একটি আবেদন আছে। এই প্রচারের ফলেই মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, সে ভগবানের লীলা-সহচর, কোন দেবতার প্রসাদ বা প্রকোপের উপর তাঁহার জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সংক্ষেপত এইঃ —

(১) যাগ নহে, যজ্ঞ নহে, তপস্যা নহে, কলিযুগে নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র যুগধর্ম্ম।

(২) কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, ভগবান শুধু ভক্তির বশীভূত।

(৩) ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন করিতে হইবে কিরূপে ?

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' ॥

তৃণের অপেক্ষাও সুনীচ এবং তরুর অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং মানশূন্য হইয়া এবং অপরকে মান দান করিয়া শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিবে। (দেখা যাইতেছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা সহজ সাধনা নহে।)

(৪) শ্রীভগবানের কৃপালেশ বা মহতের কৃপা ভিন্ন কেহ ভক্তিলাভ করিতে পারে না। এই কৃপালাভের উপায়—দৈন্য ও আর্ত্তি এবং ভগবানের শরণাগতি।

(৫) যিনি রাগানুগা ভক্তি আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন।

(৬) গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ব্যাপারে অধিকার-ভেদ স্বীকার করেন। 'ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার'। অধিকার-ভেদে কেহ শান্ত, কেহ দাস্য, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য, কেহ বা মধুর রস আশ্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্ষিতিতে যেমন পঞ্চভূতের গুণ বর্ত্তমান, তেমনি একমাত্র মধুর রসে সকল রসের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাহিত্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল মহাপ্রভুর দিব্যজীবন। এই শতাব্দীর মহাজনেরা যখনই রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই তাঁহাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে 'রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু' শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে ঢলঢল মূর্ত্তিখানি। অবশ্য, ষোড়শ শতাব্দীতে

বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারার সঙ্গে অনুবাদ-সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের ধারা প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালীর মনকে সিক্ত করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব হইতে এই যুগের কোন সাহিত্যই একেবারে মুক্ত হইতে পারে নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবসাহিত্য চরিত-সাহিত্য ও পদাবলী-সাহিত্য—এই দুই শাখায় বিভক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যকুঞ্জ সেদিন নানা বিহগের কলতানে মুখরিত হইয়াছিল, চতুর্দ্দিকে সবুজের সমারোহ দেখা গিয়াছিল। মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, বলরাম দাস, বৃন্দাবন দাস, উদ্ধবদাস, লোচন দাস, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, দেবকীনন্দন দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের যুগপৎ আবির্ভাবে বাংলার কাব্যকুঞ্জে যেন বসন্তের আনন্দ-হিল্লোল খেলিয়া গেল। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস যথাক্রমে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুগামী হইয়াও বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় নিত্যকালের সম্পদ্ পরিবেশন করিলেন ; কারণ, ইঁহারা শুধু অনুকারী ছিলেন না, ইঁহারা ছিলেন রাধাকৃষ্ণের লীলাদর্শী ও রসস্রষ্টা। কবিশেখরের পদ সংখ্যায় অল্প হইলেও তিনি শব্দচয়ন-কৌশলে ও ভাবের গভীরতায় রসিকজনের মনোহরণ করিলেন। মহাপ্রভুর চরিতকারগণের মধ্যে বৃন্দাবন দাস শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়া বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত পরিবেশন করিলেন, লোচনদাস মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত (ইহা মুরারি

গুপ্তের কড়চা নামে প্রসিদ্ধ) অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিলেন ; জয়ানন্দ প্রাকৃত জনের মনোরঞ্জনের জন্য যে 'চৈতন্য-মঙ্গল' কাব্যখানি রচনা করিলেন, তাহা অবশ্য রসিক-সমাজ বা বিদগ্ধ সমাজের অভিনন্দন লাভ করিল না। (অবশ্য, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অনেক স্থলেই তাহার প্রামাণিকতায় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।) বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তীকালে ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রকাশ, হরিচরণ দাস অদ্বৈতমঙ্গল, বিষ্ণুদাস আচার্য্য সীতাগুণকদম্ব রচনা করিলেন।* এই ভাবে বাংলায় চরিত-সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি সাধিত হইল।

এই যুগের কৃষ্ণায়ন কাব্যসমূহের মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী, মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও কবিশেখরের গোপালবিজয় শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যগুলি সে দিনের ভক্ত ও রসিক পাঠকের অন্তর ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়াছিল, সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক এই সকল কাব্যের মধ্য দিয়াই মূল ভাগবতের রস কিয়ৎ পরিমাণে আস্বাদন করিয়াছিলেন। অবশ্য, পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসুই সর্ব্বপ্রথম শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন

---

* এই শেষোক্ত কয়খানির প্রাচীনত্বে ও প্রামাণিকতায় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এবং তিনি প্রধানত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-লীলার বর্ণনা করিলেও কাব্যের প্রারম্ভে তাঁহার একটি উক্তি—

'বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।

স্বয়ং মহাপ্রভুকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিজের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

'সংসার-সাগর যদি করিতে তারণ।
ভাগবত অবতরি হিতের কারণ॥
ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া॥
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া॥
শুন হে পণ্ডিত লোক একচিত্ত মনে।
কলি-ঘোর-তিমিরে যাতে বিমোচনে'॥

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্ত কবিগণ এ বিষয়ে মালাধরের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের লীলা-রস-মাধুরী পাঠক সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিবার জন্যই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবত ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নিকট এক বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্তের বিচার-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদান্তের যথার্থ ভাষ্য। এই ভাগবতেই শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলা ও মাধুর্য্য-লীলা অপূর্ব্ব কবিত্বময় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ভাগবতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্যেরই পরি-

পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। ফলতঃ, 'কৃষ্ণায়ন' কাব্যসমূহ বৈষ্ণব সাহিত্যেরই অন্যতম ধারা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দীতেই সর্ব্বপ্রথম মহাভারতের অনুবাদ প্রচারিত হয়। কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী, রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ প্রভৃতি কবিগণই সর্ব্বপ্রথম ভারত-কথা সমগ্র বা আংশিক ভাবে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই ভাষা-গ্রন্থ প্রচারের মূলে ছিল মুসলমান রাজ-পুরুষদিগের উৎসাহ। মনে রাখিতে হইবে, তখন দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অনেকটা দূরীভূত ;—সর্ব্বোপরি, বিদেশাগত মুসলমান এই শস্যশ্যামলা নদীমাতৃকা বঙ্গভূমিকে ও এই বাংলার ভাষাকে নিজেদের আবাস-ভূমি ও মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে সারা দেশে ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন বহিয়া চলিলেও মঙ্গলকাব্য-রচনার ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতাদের মধ্যে মাণিক দত্ত, মাধব আচার্য ও মুকুন্দরামের নাম উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যকে যথার্থ সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করেন। তিনি শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর মত চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে ও বর্ণনা-ভঙ্গীতে অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, দরিদ্রের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার তুচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত-সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক না কেন, তিনি যে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার

ধর্ম্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে' তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই—বৈষ্ণব সাহিত্যের প্লাবনেও যে মঙ্গলকাব্যসমূহকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই, তাহার কারণ কি ? অনেকে মনে করেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল প্লাবন সত্ত্বেও উচ্চ শ্রেণীর অনেক নরনারী এবং বিশেষত অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ গতানুগতিক ও আচার-অনুষ্ঠান-মূলক ধর্ম্মের প্রতি মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ইঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, তাই ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলই ইঁহাদের ধর্ম্মপিপাসা ও কাব্যরস-পিপাসা যুগপৎ চরিতার্থ করিয়াছিল।

আমাদের এই নদীমাতৃকা বাংলার সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ পরিবর্ত্তনশীলতা। বাংলা দেশে বৈদিক ধর্ম্ম কোন দিনই তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, বেদান্তের মায়াবাদও বাঙ্গালীকে কোন দিন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এদেশের আদিম সংস্কৃতির সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও মুস্লিম সংস্কৃতি মিলিত হইয়া বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে। এদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছে,—আর এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালী এক বিশিষ্ট সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছে। পাল রাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সেন রাজগণের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রাজার সমর্থন লাভ করিয়াছে। তথাপি এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম দৃঢ়মূল হইতে পারে নাই। উত্তর-পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে এইখানেই বাঙ্গালী সংস্কৃতির পার্থক্য। উত্তর ভারতের সমাজ ও সভ্যতা পরিবর্ত্তনহীন ; বাংলার সমাজ ও

সভ্যতা নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল। আবার, মনীষার সঙ্গে হৃদয়াবেগের এক অপূর্ব্ব সংযোগ ঘটিয়াছে বাঙ্গালীর চরিত্রে। অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া বাঙ্গালী হৃদয়-বৃত্তিকে অনেকটা শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে এবং কিছু পরিমাণে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছে, যেমন ঘটিয়াছে নৈয়ায়িকদের জীবনে। বাঙ্গালীর উপাসনায় স্ত্রী-দেবতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। গৃহধর্ম্মেও বাঙ্গালীর আসক্তি প্রচুর। গৃহ-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী বিচিত্র রসের আস্বাদন করিয়াছে, আবার অখিল-রসামৃতসিন্ধু ভগবানকেও সে সখারূপে, সন্তানরূপে, পতিরূপে ভজনা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

'দেবতারে যাহা দিতে পারি,
তাহা দিই প্রিয়জনে,
প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি
তাহা দিই দেবতারে,
আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি,
প্রিয়েরে দেবতা

(বৈষ্ণব কবিতা)

বাংলার জলবায়ুতে কেমন করিয়া মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্ভব হইল, তাহা বুঝিতে হইলে বাঙ্গালীচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ষোড়শ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসই বাঙ্গালীর

যথার্থ গৌরবের ইতিহাস। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য বাঙ্গালীর ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই; তাই এই শতাব্দীর সাহিত্যে বিষয়-বস্তুর তেমন বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু এই শতাব্দীতেই সমগ্র দেশে ধর্ম্মের যে মহাপ্লাবন দেখা দিয়াছিল, বাংলার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ইহার কারণ, ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উৎস ছিল মহাপ্রভুর দিব্য জীবন, আর বাংলাদেশে যুগপৎ এমন সমস্ত মনীষীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাঁহাদের চিন্তাধারা একটিমাত্র কেন্দ্রের দিকে সংহত হইয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মনীষীদের চিন্তাধারা ছিল বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর মত ষোড়শ শতাব্দীতে বিদগ্ধ সমাজের সহিত জনসাধারণের বিচ্ছেদ ঘটে নাই। সেদিন পল্লীতে পল্লীতে মৃদঙ্গ ও করতাল-সংযোগে নাম-মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল, মহাজনগণের রচিত কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা-বিষয়ক পদাবলীর মাধুর্য্য গানের মধ্য দিয়া আস্বাদন করিয়া সকলে ধন্য হইয়াছিল। আবার, বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রচারের ফলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের আদর্শ দিকে দিকে প্রসার লাভ করিয়াছিল। 'বাংলায় ষোড়শ শতাব্দী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সত্যই লিখিয়াছেন—

'বর্ষা ঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই তখন দেশে যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব্ব ভাষা ও নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্য্যে ও প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল'।

তাই ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার কাব্যকুঞ্জে এমন শ্যাম সমারোহ; সে যুগের বাঙ্গালী মহাজনের হৃদয়-প্রবাহিণী বর্ষার নদীর মতই 'কানায় কানায় ভরপূর,' আর তাঁহাদের অনুরাগ-সিক্ত অন্তরখানি বর্ষার অম্বরের মতই মেঘমেদুর।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৪০৭ শকাব্দ বা ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপ নগরে যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইলেন, তখন চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় সমগ্র নগরী হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব মহাজন ও ভক্তগণের নিকট এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন ঃ

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ?
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে' ভাসে ত্রিভুবন॥

(আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ)

কবিরাজ গোস্বামী বলেন, তখন দশ দিক্ প্রসন্ন হইল, স্থাবর জঙ্গম আনন্দে বিহ্বল হইল, অদ্বৈতাচার্য্য ও হরিদাস কীর্ত্তন-রঙ্গে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, শ্রীবাসের মনে সুখোল্লাস হইল। বৈষ্ণব কবির অপূর্ব্ব কবি-কল্পনার কথা ছাড়িয়া দিলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, যিনি নাম ও প্রেমের বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত করিবেন, তাঁহার আবির্ভাব-সময়েই নবদ্বীপ নগরী হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য, নবদ্বীপের নরনারী যে সেদিন হরিধ্বনি করিয়াছিল, তাহা ভক্তির আবেগে

নহে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা লোকাচারের বশে, আর মুসলমানেরাও হিন্দুগণকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিয়াছিল। সেদিনকার নবদ্বীপে পণ্ডিতসমাজের অভাব ছিল না, কিন্তু ভক্তিধর্ম্ম নিতান্ত ম্লান হইয়াছিল। বৈষ্ণবের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। সে সময়ে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কমলাক্ষ মিশ্র বৈষ্ণব-চূড়ামণি মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের ভজনায় রত ছিলেন। এই কমলাক্ষ মিশ্র শান্তি-পুরের অধিবাসী ছিলেন, আর ইনিই পরে অদ্বৈত আচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য ও তাঁহার পার্ষদগণকে সেকালের অবৈষ্ণবগণ নানারূপ ব্যঙ্গ করিত। অদ্বৈত আচার্য্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিকট কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেন, কখনও বা হুঙ্কার-সহকারে বলিতেন, 'হে প্রভো, তুমি অবতীর্ণ হও'। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস, অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারেই ক্ষীরোদ-সাগরশায়ী নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে সেকালের নবদ্বীপের সমাজ-চিত্র চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

> 'নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
> এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
> ত্রিবিধ বইসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
> সরস্বতী-প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ॥
> সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব করে।
> বালকেও ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥

নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণরাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥

ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥

গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল'॥

(আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়)

বৃন্দাবন দাস পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায়—

(১) সে সময়ে নবদ্বীপে লোকের ধনসম্পত্তির অভাব ছিল না। নবদ্বীপে নানা জাতির বাস ছিল। গঙ্গার ঘাটে লোকের খুব ভিড় হইত।

(২) নবদ্বীপে বিদ্যা-চর্চ্চার যথেষ্ট আদর ছিল। নবদ্বীপে অধ্যয়ন না করিলে কেহ বিদ্বান্ বা পণ্ডিত বলিয়া স্বীকৃত হইতেন না। এইজন্য নানা দেশ হইতে পড়ুয়া বা ছাত্রগণ আসিয়া নবদ্বীপে মিলিত হইত। এই ভাবে সেকালের নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

(৩) সেকালে নবদ্বীপ-বাসীদের উপর লক্ষ্মীর কৃপা ছিল,

পণ্ডিত লোকেরও অভাব ছিল না ; কিন্তু মানবজীবনের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভক্তি, সেই ভক্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল। তাহারা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিতে বুঝিত লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বা পাল-পার্ব্বণ। তখন লোকে ধর্ম্মের নামে দম্ভভরে বিষহরির পূজা করিত, আর রাত্রি জাগরণ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গান শুনিত। পুত্রকন্যার বিবাহে আড়ম্বরের অন্ত ছিল না, তাই ধনের যথেষ্ট অপচয় হইত।

(৪) যাঁহারা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহারাও ভক্তিহীন ছিলেন, তাই গ্রন্থের মর্ম্মে কেহ অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিতেন না। হরিনাম-সংকীর্ত্তনই যে যুগ-ধর্ম্ম, এই সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যাঁহারা তপস্বী বা সংসারে বিরক্ত, তাঁহারাও হরিনাম উচ্চারণ করিতেন না।

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থপাঠে জানা যায়—তখন নবদ্বীপে ভক্তের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন, তাঁহারা নবদ্বীপ ভক্তিশূন্য দেখিয়া গভীর দুঃখে কালযাপন করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন এই বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। যাহারা বৈষ্ণবদিগকে উপহাস করিত, বৃন্দাবন দাস তাহাদিগকে 'পাষণ্ডী' বলিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতেও অবৈষ্ণবকে পাষণ্ডী বলা হইয়াছে, যথা—

> 'শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই তো পাষণ্ডী।
> অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী'॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেকালের নবদ্বীপ বিদ্যানুশীলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ তথায় সমবেত

হইতেন। নবদ্বীপের এই গৌরবময় যুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই যুগের বাঙ্গালী ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রে অপূর্ব্ব মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশ্য প্রাচীন কালেই বাঙ্গালী ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দশম শতাব্দীতে (৯৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে) বাঙ্গালী পণ্ডিত শ্রীধর বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্ত পাদাচার্য্যের ভাষ্যের উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা 'ন্যায়কন্দলী' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে শ্রীধরের নৈয়ায়িক প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যোড়শ শতাব্দীতে রঘুনাথ শিরোমণি 'দীধিতি' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, উহাই নব্যন্যায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি পণ্ডিতগণও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। নব্যন্যায়ে যেমন রঘুনাথ, নব্যস্মৃতি-রচনায় তেমনি রঘুনন্দন মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। যদিও রঘুনন্দন হিন্দুসমাজের স্থিতির জন্য এমন অনেক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন যাহা মানব-ধর্ম্মের বিরোধী, তথাপি তাঁহার শাসনদ্বারা আজও বাঙ্গালী সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' সমাজতত্ত্ব-বিদ্‌গণের বিশেষ ভাবে আলোচ্য। এই যুগে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্র সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তখন নবদ্বীপের টোলে ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা চলিত। অবশ্য যাঁহারা তন্ত্রমতে সাধনা করিতেন, তাঁহারা অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিভূতি-লাভের চেষ্টা করিতেন এবং নানারূপ

ব্যভিচারেরও প্রশ্রয় দিতেন। সে কালে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চা একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। তখন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণের বিশেষ মর্য্যাদা ছিল, আর তাঁহাদের বিধান অনুসারেই সমাজ শাসিত হইত। ইঁহাদের ভরণ-পোষণের ভার অনেক ক্ষেত্রে কায়স্থ জমিদারেরা গ্রহণ করিতেন। সমাজ-পতিগণের শাসন অত্যন্ত কঠোর ছিল। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশে মুসলমানগণের অত্যাচার একেবারেই ছিল না, একথা সত্য নহে। রাজা সুবুদ্ধি রায় পদচ্যুত ও হোসেন শাহ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে সুবুদ্ধি রায়ের জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে মুসলমানদের অত্যাচার এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের অনুদারতা ও কঠোরতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুবুদ্ধি রায় মুসলমানের জলপান করিতে বাধ্য হইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে মৃত্যুবরণ করিবার ব্যবস্থা দেন। অবশেষে তিনি মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন ও তাঁহার কৃপা-লাভ করিয়া ধন্য হন।

সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে সে সম্পর্কেও কিছু ধারণা জন্মে। নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আসেন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তথায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গে তখন বিদ্যা-চর্চ্চার বিশেষ মর্য্যাদা ছিল। তাই তাঁহার আগমনে অগণিত বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সকলেই মনে করিল, নিমাই পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করা বিশেষ স্কৃতির ফল। আর যখন তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ অজস্র দ্রব্যসম্ভার তাঁহার চরণে উপহার দেন।

আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখিয়াছি, সে সময়ে নবদ্বীপে ভক্ত বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। প্রথম জীবনে নিমাই স্বয়ং ছিলেন উদ্ধত পণ্ডিত, তাঁহার মধ্যে প্রেম-ভক্তির কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। নিমাইর মত একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত যে ভক্তি-বিহীন ইহা মনে করিয়া তৎকালীন ভক্ত বৈষ্ণবেরা ক্লেশ পাইতেন। অবশ্য চৈতন্যভাগবতের লেখক আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, 'বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহারে'। সে যাহা হউক, নবদ্বীপে যিনি শুষ্ক শাস্ত্রালোচনায় কাল যাপন করিতেন, যাঁহার মধ্যে লেশমাত্র প্রেম-ভক্তিও প্রকট হয় নাই, তিনি কিন্তু হরি-নামের বন্যায় পূর্ব্বাঞ্চল প্লাবিত করিয়াছিলেন। সম্ভবত, তখনকার পূর্ব্ববঙ্গে নবদ্বীপের তুলনায় ভক্তের সংখ্যা অধিক ছিল, পাণ্ডিত্যের অভিমান তথায় তেমন প্রশ্রয় পায় নাই, তান্ত্রিক সাধনার নামে অনাচার বা ব্যভি-চারের স্রোতও প্রবাহিত হয় নাই। অন্তত, একথা সত্য যে, নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদিগকে ভক্তি-ধর্ম্মের যোগ্য অধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হয়তো 'নামে রুচি' ছিল স্বাভাবিক। তাই সেখানে তিনি চণ্ডাল পতিত, অস্পৃশ্য অশুচি সকলকেই উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যে স্বয়ং করুণার অবতার, পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদের এরূপ প্রত্যয়ও

জন্মিয়াছিল। নিমাই যখন নবদ্বীপে ফিরিয়া যান, তখন পূর্ব্ববঙ্গ-বাসীরা বলিয়াছিলেন—

'চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
নাম দিয়া সবারে কৈল ভব পার॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সর্ব্বলোক আপনি যাচিয়া॥
যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি।
ভবনদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এ হেন করুণা নাহি শুনি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কেবা পাপ মাগে॥
সভারে পবিত্র কৈল সমভাব করি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের করিল অধিকারী'॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

কিন্তু তখন নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম্ম ম্লান হইলেও বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুলীনগ্রামে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। হরিদাস ঠাকুর কুলীনগ্রামের নিকটে বেনাপোল গ্রামে প্রতিদিন তিন লক্ষ বার হরিনাম জপ করিতেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই কুলীনগ্রামের অধিবাসীরা এই হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই কুলীনগ্রামেই 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের' রচয়িতা মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু স্বয়ং যেন শতমুখে কুলীনগ্রামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সে হো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ পায়'॥

(আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ)

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে, কুলীনগ্রামে এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ ছিল। এই কীর্ত্তনীয়া দল প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতেন। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে মনে হয়, মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে নবদ্বীপে ধর্ম্মের যে গ্লানি ঘটিয়াছিল, সেই গ্লানি হইতে কুলীনগ্রাম সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

তবে, বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই যে সে সময়ে সমাজের শাসন খুব কঠোর ছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। হিন্দু রাজত্ব-কালেই রাজা হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট 'ব্যবহার-তিলক,' 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া সমাজকে কঠোর বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন। 'বাংলা দেশের ইতিহাসে' সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—

'ভবদেব বিধান করিয়াছেন যে চণ্ডালস্পৃষ্ট ও চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির পাত্রে রক্ষিত জল পান করিলে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। শূদ্রের জল পান করিলে ব্রাহ্মণের সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধি হইত। ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে এরূপ কোন নিষেধ দেখা যায় না।' (পৃঃ ১৭৯) ভবদেবের মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের অধ্যাপনা বা যাজনও নিষিদ্ধ ছিল, এরূপ করিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে

হইত। তুর্কী যুগে সমাজের বন্ধন যে কঠোরতর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময়ে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের লোকেরা নৃসিংহাচার্য্যের অনুমোদিত 'কমঠবৃত্তি' বা 'কূর্ম্মবৃত্তি' অবলম্বন করিয়া কোন মতে আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহারা অতি লঘু পাপে অথবা বিনা অপরাধে কত-জনকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তখন উচ্চবর্ণের লোকেরা সমাজপতিগণের অনুদারতা ও অদূরদর্শিতার ফলে তুচ্ছ কারণে সমাজচ্যুত হইয়াছেন, আর যে সকল কারণে হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা পরধর্ম্ম আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সমাজের সঙ্কীর্ণতা উহার অন্যতম। মানবধর্ম্ম যখন এইভাবে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত, যখন লোকশিক্ষার বহু ধারা প্রবাহিত হইলেও সংস্কৃতের বিদ্যাভাণ্ডারের দ্বার তথাকথিত শূদ্র জাতির পক্ষে রুদ্ধ, বাংলার সেই দুর্দ্দিনে নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর আবির্ভূত হইয়া ভক্তি-ধর্ম্ম ও মানব-ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আর তাঁহারই নির্দ্দেশে প্রভু নিত্যানন্দ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অধম-অস্পৃশ্য, পতিত-পাষণ্ড সকলের জন্যই তিনি যজ্ঞশালার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এ যেন পুরাকালের সেই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ—বাঙ্গালীর জীবনে এ এক মহামহোৎসব—এই যজ্ঞে যাহারা যোগদান করিয়াছে কেহই রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই, আর যে সম্পদে তাহারা ধনী হইয়াছে, সেই সম্পদের নিকট পার্থিব ধনরত্ন সকলই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

মধ্যযুগের চরিত-সাহিত্য

ভারতবর্ষে একদিন লোকোত্তর পুরুষ বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট চরিত-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, সিংহলী প্রভৃতি নানা ভাষায় তথাগতের অবদানসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত, জাতক, ললিতবিস্তর, মহাবগ্‌গ প্রভৃতি গ্রন্থই বুদ্ধচরিতের প্রধান উপাদান। এই সমস্ত গ্রন্থে আমরা যেমন মানুষ বুদ্ধকে দেখি, তেমনি বুদ্ধের চরিত-সংক্রান্ত বহু অলৌকিক কাহিনীরও বর্ণনা দেখিতে পাই। পৃথিবীতে যাঁহারা অবতাররূপে পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনেই এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রাধান্য পাইয়াছে। বাইবেলের সেণ্ট্ ম্যাথু, সেণ্ট লিউক প্রভৃতি গ্রন্থে ঈশার যে চরিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কতই না অতিলৌকিক ঘটনা বা Miracles বর্ণিত হইয়াছে! শঙ্করাচার্য্যের চরিত-কথায় অলৌকিক কাহিনীর এমন প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে যে, তাঁহার যথার্থ জীবনী উদ্ধার করা ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শুধু প্রাচীন বা মধ্যযুগের কথা বলি কেন, এ যুগেও রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষের জীবন-চরিত রচিত হইয়াছে, তাহাতে অল্প-বিস্তর অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলা সাহিত্যে

সর্ব্বপ্রথম চরিত-সাহিত্যের প্রবর্ত্তন হয়। আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায়ও চরিত-সাহিত্য রচিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, এই সাহিত্য ভক্তগণের রচিত, আর ইঁহারা সকলেই ভাবাবিষ্ট হইয়া অবতারের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই চরিতসাহিত্যে মহাপ্রভুর জীবনের যে সকল মূল্যবান্ উপাদান আছে, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য এ যুগের ঐতিহাসিকেরা প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু শুধু ঐতিহাসিকের বিচার-বুদ্ধি লইয়া মহাপ্রভুর অন্তর্জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। আর, যাঁহারা পৃথিবীতে অবতার বা মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে বাহিরের ঘটনা বা সন-তারিখই মুখ্য নহে; তাঁহাদের কর্ম্ম-ধারার উৎসমুখে পৌঁছিতে পারিলেই তাঁহাদের জীবন আমাদের কাছে তাৎপর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠে। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইলে আমাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বিশিষ্ট সাধনার ধারা অনুসরণ করিতে হইবে। যিনি শুধু বিশ্লেষণী বুদ্ধি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কথা আলোচনা করিবেন, তিনি কখনও শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক লীলার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিবেন না।

আমরা এবার মহাপ্রভুর চরিতকারগণের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মুরারি গুপ্ত

যিনি মহাপ্রভুর দিব্য জীবন অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রথম চরিত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার

প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত কবি মুরারি গুপ্ত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় যে চরিত-গ্রন্থ রচনা করেন, উহা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী চরিতকারগণের মধ্যে কবি কর্ণপূর ও লোচনদাস এই কড়চার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। চৈতন্য-ভাগবতে লিখিত হইয়াছে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে যে সব ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে

'শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান'॥

রঘুনাথের উপাসক মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে এই প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং যুগাবতার আর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি কার্য্যাবতার। মুরারি মহাপ্রভুর অনেক অলৌকিক লীলার কথা বিবৃত করিয়াছেন, যেমন প্রভুর বরাহ-ভাবের আবেশ।

মুরারি গুপ্তের কড়চার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও স্থানে স্থানে কবিত্ব-পূর্ণ। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, স্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ্য লীলাসমূহের সূত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। মুরারি গুপ্তের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু যুগাবতার, কিন্তু স্বরূপ দামোদর বলিয়াছেন—

'রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্' ॥

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি (অর্থাৎ যে শক্তি তাঁহাকে আহ্লাদিত করেন), তিনি কৃষ্ণপ্রণয়ের বিকৃতি বা বিলাসরূপিণী, তাঁহারা একাত্মা হইয়াও লীলারস-আস্বাদনের জন্য দেহভেদ স্বীকার করিয়াছেন। আবার, তাঁহারা চৈতন্যাবতারে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ; কেননা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমতী রাধার ভাব ও কান্তি আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি রাধা-ভাব-দ্যুতি বিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি।

কবি কর্ণপূর

মহাপ্রভুর অন্যতম পরিকর শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন 'কবি কর্ণপূর' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি মহাপ্রভুর লীলা-অবলম্বনে 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' নামে একখানি মহাকাব্যও প্রণয়ন করিয়াছেন। কবি কর্ণপূর অনেক স্থলে মুরারি গুপ্তের নিকট ঋণী হইলেও তাঁহার মহাকাব্যে কিছু নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবি কর্ণপূর শব্দচয়নে ও অলঙ্কার-প্রয়োগে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কারণ (১) ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবগণের উদ্ধার (২) মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের নিরসন এবং (৩) রাগানুগা ভক্তির প্রচার।

বৃন্দাবন দাস

বৃন্দাবন দাসই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মহাপ্রভুর চরিত-কথা রচনা করেন। নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাস শ্রীমন্নিত্যানন্দের মুখে যে লীলা-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই চৈতন্য-ভাগবতে নিবদ্ধ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন দাস একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি যেমন পণ্ডিতের নিকট, তেমনই অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাসকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়াছেন এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

'চৈতন্য-লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন ॥
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ' ॥

চৈতন্য-ভাগবতের মাহাত্ম্য তিনি এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য' ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন দাস ব্যাসদেবের অবতার-রূপে পূজিত হইতেছেন।

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—মহাপ্রভু প্রধানত যুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন প্রচারের দ্বারা কলি-কলুষ-হত জীবগণের উদ্ধার-সাধনের জন্য এবং যাহারা পাষণ্ডী অর্থাৎ ভক্তিবিমুখ, তাহাদিগকে

দলন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যেমন মহাপ্রভুরূপে, তেমনই বলরামও নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বৃন্দাবন দাস এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বন্দনা করিয়াছেন—

'আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ'॥

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের আদি লীলার বর্ণনা করিতে গিয়াও তাঁহার ভগবত্তার কথা বিস্মৃত হন নাই। নিমাইর জীবনে যখন প্রেম বা ভক্তির কোন লক্ষণই পরিস্ফুট হয় নাই, যখন তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তখনও বৃন্দাবন দাস আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, 'বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে'। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-স্থাপনের এই সজ্ঞান প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁহার গ্রন্থে মানুষ শ্রীচৈতন্যের যে উজ্জ্বল আলেখ্য স্থানে স্থানে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি না। প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য বৃন্দাবন দাস দাস্যরস আশ্রয় করিয়া ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন, সুতরাং মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য-লীলাই তাঁহার গ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা-প্রচারও তাঁহার গ্রন্থ-রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বা নীলাচল-লীলার বর্ণনা করেন নাই, সুতরাং মহাপ্রভুর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চিত্র চৈতন্যভাগবতে অঙ্কিত হয় নাই। ইহার কারণস্বরূপ কবিরাজ

গোস্বামী বলিয়াছেন, নিত্যানন্দের লীলা-বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস এমনই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

'নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ'॥

বৃন্দাবন দাস পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই। ভক্ত কবি বৃন্দাবন দাস ভাবাবিষ্ট হইয়াই চৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছেন। তাই তাঁহার এই গ্রন্থ ভক্তগণের হৃৎ-কর্ণের রসায়নস্বরূপ। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকটও এই গ্রন্থের মূল্য স্বল্প নহে। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি, চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের সম-সাময়িক নবদ্বীপের সমাজ-চিত্র চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্র হইতে আমরা মধ্যযুগের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক তথ্য জানিতে পারি। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানে' নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য' সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনায় ক্রমভঙ্গ, অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক ঘটনা-সংযোজনার প্রবৃত্তি থাকিলেও সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার গ্রন্থ ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মূল্যবান্। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বৈষ্ণবদের মধ্যে মতভেদ, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবিধ কার্য্যকলাপ ও গৌড়দেশে প্রেমধর্ম্ম-প্রচার-সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থই আমাদের একমাত্র উপজীব্য। গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বম্ভরের নবদ্বীপ-লীলার যে চিত্র বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অঙ্কন করিয়াছেন,

তাহা হইতে আমরা বিশ্বম্ভরের ভাবজীবন-সম্বন্ধে যতটা জ্ঞানলাভ করি, তাঁহার বহিরঙ্গ জীবনের শত শত খুঁটিনাটি ঘটনা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিলেও আমরা তাহার শতাংশের একাংশও জানিতে পারিতাম না। বৃন্দাবন দাসের কবিত্ব-শক্তি অতুলনীয়। কবির অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেমের যে আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন তাহা রসিক জনের পরম আদরের ধন। ঐতিহাসিকের বহির্মুখী দৃষ্টির নিকট খুঁটিনাটি ঘটনায় বৃন্দাবন দাসের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়িলেও, ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত ঐতিহাসিক তথ্যের আকরস্বরূপ'। (পৃঃ ২২১-২২)

জয়ানন্দ

সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র ও গদাধর গোস্বামীর শিষ্য জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে মহাপ্রভুর একখানি চরিত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি নানা ভ্রম-প্রমাদে ও অবান্তর কাহিনীতে পূর্ণ। জয়ানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য যুগাবতার, চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—

'আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চৈতন্য জগন্নাথ।
যুগাবতার হেতু ব্রহ্মকুলে জাত'॥

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের আদর্শ তাঁহার হস্তে শুধু ম্লান হয় নাই, অনেকাংশে বিকৃতও হইয়াছে। এইজন্য জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বর্জ্জন করিয়াছেন। এরূপ অপ্রামাণিক গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিরোধানের যে কাহিনী

বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও নির্ব্বিচারে গ্রহণযোগ্য নহে। জয়ানন্দ বলেন, টোটা গোপীনাথের মন্দিরে মহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটিয়াছিল ; কিন্তু লোচন দাসের মতে গুঞ্জাবাড়ীতে প্রভু জগন্নাথে লীন হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটিয়াছিল আষাঢ় মাসে, সপ্তমী তিথিতে, রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরে।

যে মহাপ্রভু 'বহিরঙ্গ লইয়া নাম-সংকীর্ত্তন' করিয়াছেন এবং নীলাচল-লীলায় যিনি স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত নিরন্তর রস-আস্বাদন করিয়াছেন, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' সেই মহাপ্রভুর কোন পরিচয় মিলে না।

লোচন দাস

লোচন দাস প্রধানত মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে 'চৈতন্য-মঙ্গল' রচনা করিলেও কয়েকটি নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। লোচন দাস নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন, আর এই নরহরি সরকার ছিলেন 'নদীয়া-নাগর-ভাবের' উপাসক। লোচন দাস সূত্রখণ্ডে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতির সঙ্গে নরহরি সরকারেরও বন্দনা করিয়াছেন, যথা—

'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥'

লোচন অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা স্বভাবতই হৃদয়-মন স্পর্শ করে। অবশ্য লোচনের উপাসনা-

প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র, কেননা, তিনি ছিলেন নরহরি সরকারের অনুগামী। লোচনের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন—'বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসে লোচনের গ্রন্থ খুব মূল্যবান্—কেননা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি শাখার উপাসনা ও ভাব-সাধনা-প্রণালীর বিশদ ও অকৃত্রিম বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়'।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

পরম ভাগবত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আমাদিগকে চৈতন্যচরিত-রূপ যে অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি, তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। যাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে 'চরিতামৃত' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কবি-প্রতিভা, গভীর দার্শনিকতা ও তত্ত্বদৃষ্টি এবং প্রগাঢ় রসানুভূতিতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। চৈতন্য-চরিত-বর্ণনার ছলে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও শ্রীরূপ গোস্বামি-কথিত অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। প্রধানত, মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বা দিব্যোন্মাদ-দশা বর্ণনা করিবার জন্যই তিনি গ্রন্থ-খানি রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকের বিচারে তিনি মহা-প্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও ভাব-দৃষ্টিতে সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ-রচনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে

গিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—আমার পূর্ব্বগামী লেখক 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর লীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিত্যানন্দের লীলা-বর্ণনায় এমনই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

'বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন।
সূত্রধর কোন্ লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন'॥

(আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

অতঃপর কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—আমি মদনগোপালের আজ্ঞা পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম-ধ্যান ও তাঁহার আজ্ঞা-গ্রহণ করিয়া আমি গ্রন্থ-রচনায় সাহসী হইয়াছি। বৃন্দাবন দাস যাহা বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা আমি সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছি,

আর তিনি যাহা বর্ণনা করেন নাই, তাহাই আমি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

অতএব দেখা যাইতেছে, চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও উভয় গ্রন্থের ঘটনা-বর্ণনায় অনেক অনৈক্য আছে। দিগ্বিজয়ী-বিজয় বা কাজী-দলনের প্রসঙ্গ যে উভয় গ্রন্থে একরূপ নহে, তাহা অসতর্ক পাঠকের নিকটও ধরা পড়ে।

চৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বত্র কবিরাজ গোস্বামী কবিত্ব-প্রকাশের অবকাশ পান নাই, কিন্তু যখনই তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া বা কোন রসিক মহাজনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সংস্কৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য বাংলায় প্রকাশ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার রচনা অনুভূতির গভীরতায় অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকের একটি শ্লোকের তাৎপর্য্য এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

'উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগর-রাজ, ভিতরে শঠের কাজ
পর-নারী বধে সাবধান।
সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে হায় না রবে পরাণ॥

কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে, নারি উকাশিতে ॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার ॥
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার
সখি! মোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রে জল
ততদিন জীবে কোন্ জন ॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে' ॥

(মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে সনাতন গোস্বামীর নিকট কৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলার বর্ণনা করিতেছেন, সেখানে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা ভাবের গভীরতায় ও অনুভূতির সান্দ্রতায় আমাদের হৃদয় স্পর্শ

করে। সত্যই কবিরাজ গোস্বামী যে বৃন্দাবন-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী মহাজন, চরিতামৃত পাঠ করিলে সে বিষয়ে আমাদের আর কোন সংশয় থাকে না—

'চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন্মথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে গোগণ-চারণ-রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার বকপাঁতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত সার'॥

(মধ্যলীলা, একবিংশ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুধু একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, দর্শন-শাস্ত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীমন্মহা-প্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের সহিত বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন এবং শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' স্থাপন করিতেছেন। মহা-প্রভুর মতে বেদান্তসূত্রে কোন ভ্রম থাকিতে পারে না, কেননা, স্বয়ং ভগবান ব্যাসদেব উহার রচয়িতা। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর

বেদান্তের মুখ্য অর্থ গোপন করিয়া গৌণ অর্থ স্থাপন করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বুঝা যায় বৃহত্তম বস্তু, সুতরাং ব্রহ্ম শব্দে ভগবানকেই বুঝায়। তিনি নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার নহেন, তাঁহার বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের যেমন ভেদের সম্পর্ক রহিয়াছে, তেমনি আবার অভেদের সম্পর্কও রহিয়াছে।

'ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ'॥

(আদিলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

ঈশ্বরও চৈতন্যময়, জীবও চৈতন্যময়, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অভেদের সম্পর্ক রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর বিভুচৈতন্য আর জীব অণুচৈতন্য, তাই তাঁহাদের মধ্যে ভেদের সম্পর্কও রহিয়াছে। এই যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক, ইহা অচিন্ত্য, মানব-বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয়। আচার্য্য শঙ্কর 'তত্ত্বমসি'কে মহাবাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম এক নহে, সুতরাং 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য হইতে পারে না। ব্রহ্মবাচক প্রণব বা ওঙ্কারই যথার্থ মহাবাক্য। প্রেমই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ, আর এই প্রেমের দ্বারাই কৃষ্ণ বশীভূত হন।

'পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হইতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত বশ!
প্রেমা হইতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস'॥

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর অদ্বৈত-বাদ-সম্পর্কে বিচার এবং সার্ব্বভৌমের উদ্ধার-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের মতের অনুসরণ করেন, তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদের উপলব্ধিই মুক্তি। মহাপ্রভু কিন্তু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন,—ভক্ত বরঞ্চ নরক বাঞ্ছা করিবে, তথাপি এরূপ মুক্তি (সাযুজ্য মুক্তি) কামনা করিবে না।

'সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়'॥
(মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

সনাতন গোস্বামী যখন মহাপ্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ'ত আপনি'॥
(মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ)

তখন মহাপ্রভু তাঁহার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়'।
(মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ)

ইহাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব।

আমরা বলিয়াছি, মহাপ্রভুর মতে ঈশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য, তাই তিনি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী'।

(আদিলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

মহাপ্রভু বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়া পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্কর বলেন, জগৎ মিথ্যা, আমাদের অজ্ঞানবশতই ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রতিভাত হন। ইহাকেই বলা হয় বিবর্ত্তবাদ। প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

'ব্যাসের সূত্রে কহে পরিণামবাদ।'

কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর

'ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ।
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুত ! পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান'॥

(আদিলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী নানা প্রসঙ্গে উহা বিবৃত করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে কবিরাজ গোস্বামীর পাণ্ডিত্য যে অগাধ ছিল, চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে সে সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

শুধু গৌড়ীয় দর্শন নয়, শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তৃক ব্যাখ্যাত রসশাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে তাঁহার যে গভীর অনুপ্রবেশ ছিল, চৈতন্য-চরিতামৃতের স্থানে স্থানে তাহার পরিচয় আছে। আমরা মধ্য-লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উত্তম অধিকারী রামানন্দের মনে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বই স্ফুরিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রেমধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য, এই অধ্যায়ের জন্য কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটকের নিকট তিনি অনেক পরিমাণে ঋণী।

মহাপ্রভু যখন রামানন্দকে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ সাধ্যবস্তু নির্ণয় করিতে বলিলেন, তখন রামানন্দ সংক্ষেপে উত্তর করিলেন—

'স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়'।

স্বধর্ম্মাচরণ বলিতে বুঝায় বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রম-ধর্ম্মের পালন, শাস্ত্রীয় বিধির অনুসরণ। তারপর মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ যথাক্রমে বলিতে লাগিলেন—

(১) কৃষ্ণে কর্ম্মফল অর্পণই শ্রেষ্ঠ সাধ্য।

(২) স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অতিক্রম করিয়া ভগবানের যে ভজনা, উহাই সাধ্যসার।

(৩) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে আশ্রয় করা স্বধর্ম্মত্যাগের অপেক্ষা শ্রেয়।

(৪) জ্ঞানশূন্যা ভক্তি ইহার অপেক্ষাও উত্তম।

(৫) প্রেমভক্তি আরও উচ্চতর আদর্শ।

রামানন্দ এ পর্য্যন্ত ব্রজ-প্রেমের কথা বলেন নাই। মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি যথাক্রমে দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও কান্তাপ্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তারপর বলিলেন, পৃথিবীতে যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ বর্ত্তমান, মধুর বা শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসেও তেমনিই সকল রসের লক্ষণ বর্ত্তমান। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; কিন্তু পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সকলই বর্ত্তমান। তেমনই শান্তরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা, দাস্যরসে এই নিষ্ঠার সঙ্গে রহিয়াছে সেবা (যেমন দেখিতে পাই হনুমানের মধ্যে), সখ্য রসে এই দুইটি গুণের সহিত যুক্ত হইয়াছে আত্মবৎ ব্যবহার (যেমন শ্রীদাম-সুদাম-বসুদামের কৃষ্ণপ্রীতিতে), বাৎসল্য রসে সখ্যরসের গুণ তো আছেই, তদুপরি আছে সন্তানবৎ লালন ও রক্ষণ ; আর মধুর রসে বাৎসল্যের গুণের সঙ্গে রহিয়াছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। রায় রামানন্দ বলিতেছেন—

> ‘পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
> দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
> গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
> শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥
> আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
> দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
> পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
> এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে’॥

এই প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন ব্রজদেবীগণ, তাই তাঁহাদের সাহচর্য্যে মাধুর্য্য অশেষ রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ব্রজগোপী-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন মহাভাবময়ী রাধিকা।

'ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি'॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কে? তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি সর্ব্ব-অবতারী, সকল কারণের কারণ, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল শক্তি, সকল রসে তিনি পরিপূর্ণ। তাঁহার দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি স্থাবর, জঙ্গম সকলই আকর্ষণ করেন। তিনি মদনমোহন, তাই ভাগবতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'। আর শ্রীমতী রাধা কে? তিনি শুধু কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী নহেন, তিনি মহাভাবময়ী।

'হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী'॥

রায় রামানন্দ বলিয়াছেন—যদি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করিতে হয়, তবে গোপীগণের অনুগত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে।

'রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে'॥

সত্যই কবিরাজ গোস্বামী চরিতকার-হিসাবে আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও রসবেত্তা,—তিনি ভাব-দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার অঙ্কিত চিত্র এমন মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। চরিতামৃতেও মহাপ্রভুর জীবনের অনেক অলৌকিক লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কারণ, অন্যান্য চরিতকারের ন্যায় কবিরাজ গোস্বামীও মহাপ্রভুর ভগবত্তায় গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর লীলা তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের নিকট যেমন শুনিয়াছেন, তেমন ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-লীলার বা তাঁহার দিব্যোন্মাদের যে আলেখ্য তিনি নিপুণ ও রসগ্রাহী চিত্রকরের ন্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরদিন আমাদের নিকট নমস্য ও বরণীয় হইয়া থাকিবেন।

চরিত সাহিত্য হিসাবে যে সমস্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতায় সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে, আমরা উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করিব না। গোবিন্দ দাসের কড়চার অপ্রামাণিকতা সম্পর্কে বাংলায় একদিন যে আন্দোলনের ঝড় বহিয়া গিয়াছিল, উহা আজ স্তব্ধ হইয়াছে। কড়চা যে সর্ব্বাংশে বা অনেকাংশে অপ্রামাণিক, সে বিষয়ে আজ পণ্ডিতগণের মনে কোন সংশয় নাই। মহাপ্রভুর যে সমস্ত চরিত-গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, উহাদের সঙ্গেও কড়চার অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়ে। কড়চার ভাষায় পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক শব্দের প্রয়োগ এবং বহু শব্দের আধুনিক রূপও কড়চার প্রামাণিকতায় সন্দেহ উপস্থিত করে।

চরিত-সাহিত্যের মধ্যে আরও কয়েকখানি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যথা—ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ,' হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', বিষ্ণুদাসের 'সীতাগুণকদম্ব' ও লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র'। এই সমস্ত গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অদ্বৈতাচার্য্যের মহিমা-খ্যাপন। মহাপ্রভুর প্রামাণ্য জীবনচরিত-সমূহের সহিত এই সমস্ত গ্রন্থের অসঙ্গতি এত বেশী যে উহা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। অধিকন্তু, এই সমস্ত গ্রন্থের পরস্পরের মধ্যে বিরোধও স্বল্প নহে।

আমরা দেখিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে বাংলা দেশে সাহিত্যের একটি নূতন শাখার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। মধ্য-যুগের এই চরিত-সাহিত্যে যাঁহারা আধুনিক চরিত-সাহিত্যের ন্যায় কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োগ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, শুধু ঐতিহাসিক বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে আমরা কোন মহাপুরুষ বা লোকোত্তর পুরুষের অন্তর্জীবনে প্রবিষ্ট হইতে পারি না। শ্রদ্ধা-বুদ্ধির অভাবে আমরা অনেক সময় মহাপুরুষদের প্রতি অবিচার করিয়া থাকি। মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

'অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকম্
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্'।

(কুমারসম্ভব, পঞ্চম সর্গ)

মহাপুরুষদের চরিত অলৌকিক, তাঁহাদের কার্য্যকলাপের হেতুও

অনেক সময় বুদ্ধির অগম্য, তাই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা তাঁহাদের চরিত্রের নিন্দা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরম ভক্ত, শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় বিশ্বাসী। নবদ্বীপ-লীলার সময়েই মুরারিগুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হন। সেই সময় হইতে মহাপ্রভুর ভগবত্তা-সম্পর্কে ভক্তগণের মনে কোন সংশয় থাকে না। মহাপ্রভু অপ্রকট হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বিগ্রহ স্থাপিত ও অর্চ্চিত হইতে আরম্ভ করে। চরিতকারগণের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে স্বয়ং ভগবানই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে লীলা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভগবানের লীলা মানুষী বুদ্ধির অগম্য, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তাহা লইয়া তর্ক চলে না। এখনও গৌড়ীয় ভক্তগণ তদ্ভাবভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের লীলারস আস্বাদন করেন, মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা-সম্পর্কে তাই তাঁহাদের মনে কোন সংশয় জাগে না। কিন্তু যাঁহারা ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সত্য নিরূপণ করিতে চাহেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর জীবনের অলৌকিক কাহিনীসমূহ বর্জ্জন করেন ও বিভিন্ন চরিত-গ্রন্থের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিকের এই বিচার-পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয় বা নিষ্ফল নহে; আর মহাপ্রভুর জীবনের অলৌকিক কাহিনী বর্জ্জন করিলেও তাঁহার দেব-মহিমা হয়তো ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু যে ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাহীন, যিনি অন্তত কিয়দংশেও মহাপ্রভুর ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া তাঁহার চরিত-গ্রন্থ পাঠ করেন, গৌরাঙ্গ-লীলার রস-আস্বাদনে যিনি বঞ্চিত,

তিনি কখনও মহাপ্রভুর অন্তর্জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না। যে ঐতিহাসিকের মধ্যে শ্রদ্ধা-বুদ্ধি ও বিচার-বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়াছে (ভক্তগণের মতে অবশ্য এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী), একমাত্র তিনিই মহাপ্রভুর চরিত-সম্পর্কে আলোচনা করিবার যথার্থ অধিকারী।

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবদর্শন

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া যখন ধীরে ধীরে পূর্ব্ব দিগন্তে উষার আলো ফুটিয়া উঠে, তখন নানাজাতীয় বিহঙ্গের সুর-তরঙ্গে আকাশ-বাতাস প্লাবিত হয়। যখন কোন দেশে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন জাতির জীবনে নামিয়া আসে অমানিশার গাঢ় তমসা, নৈরাশ্য ও অন্ধকার তাহার প্রাণশক্তিকে অভিভূত করিয়া দেয়। তারপর যখন কোন মহাপুরুষ বা লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন জাতির চোখে ফুটিয়া উঠে নবীন উষার সূর্য্যালোক, তাহার দীর্ঘ সুপ্তির জড়িমা টুটিয়া যায়। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বাঙ্গালীর জীবনে একদিন এমনি নৈরাশ্য ও অবসাদ আসিয়াছিল, বৈদেশিক আক্রমণের আঘাতে তাহাদের প্রাণপুরুষ হইয়াছিল স্তব্ধ ; জয়দেবের 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' বা বিদ্যাপতির তরঙ্গ-লীলায়িত প্রেমের অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ঝঙ্কার তাহাদের প্রাণে ক্ষণিক আনন্দের সৃষ্টি করিলেও তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে নাই।

তাই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন ও শিক্ষা সমগ্র জাতির প্রাণ আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, আলোকে-পুলকে একেবারে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, একই সঙ্গে চারিদিকে দেখা গিয়াছিল বর্ষার মহাপ্লাবন ও বসন্তের সবুজ সমারোহ। জীবন ও জগৎ-সম্পর্কে বাঙ্গালী লাভ করিয়াছিল এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। দেবতার নর-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া সে আপন মহিমা-সম্পর্কে সচেতন হইয়াছিল। বুঝিয়াছিল, হীন-পতিত-অস্পৃশ্য-অশুচিদের উদ্ধারের জন্যই ভগবান মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনী ও বাণীর উপর ভিত্তি করিয়াই বাঙ্গালী এক অভিনব দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দ ভাষ্য' নামে বেদান্তের যে নূতন ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই দর্শনশাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ভাষ্যে যে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব' স্থাপিত হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার প্রবর্ত্তক। চৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশানন্দ ও সার্ব্বভৌমের সহিত বেদান্ত-বিচারে ও সনাতন-শিক্ষায় এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শনের ক্রম-বিকাশে বা বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান কতখানি, তাহা বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব দর্শনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ কিভাবে ব্রহ্মসূত্রের উপর ভক্তি-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা না থাকিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া যাইবে না।

রামানুজ

আচার্য্য শঙ্করের তিরোভাবের প্রায় তিন শত বৎসর পরে আচার্য্য রামানুজ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি বেদান্তদর্শনের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা 'শ্রীভাষ্য' নামে বিখ্যাত। এই ভাষ্যে তিনি প্রখর যুক্তির সাহায্যে শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম নিগুর্ণ ও নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, তিনিও মায়াকল্পিত। রামানুজের মতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বটেন কিন্তু নিগুর্ণ নহেন, তিনি সকল কল্যাণগুণের আকর, 'He is infinite in the infinity of His infinite attributes.' জীব ও জড়, চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মেরই দেহ। সুতরাং জীব-জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য। এই জন্যই রামানুজের এই মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। এই মতেও ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; কেননা, ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা জীব বা জগতের নাই।

শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ প্রবল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন।

শঙ্করের ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় নহেন। শঙ্করের মতে ভক্তিও অজ্ঞান-প্রসূত, তবে ইহা চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়া অবস্থাবিশেষে আশ্রয়ণীয়। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি করিবার উপায়— শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। কিন্তু রামানুজের মতে ব্রহ্ম

উপাসনা বা আরাধনার বস্তু। আর ভগবানের উপাসনা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভগবানের দেহ আছে বটে কিন্তু সে দেহ অপ্রাকৃত। রামানুজের মতে ধ্রুবা স্মৃতি অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার গুণাবলীর স্মরণের নামই ভক্তি। শরণাগতি বা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই এবং অনাসক্ত ভাবে শাস্ত্রোক্ত বিধি পালন করিতে পারিলেই আমাদের কর্ম্ম-বন্ধন ক্ষয় হয়। যিনি একান্ত ভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন এবং নিরন্তর তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করেন, ভগবান তাঁহার প্রতি প্রীত হন। ভক্ত তখন মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাকে আর সংসারে গতায়াত করিতে হয় না। তিনি ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হন কিন্তু কখনও ভগবানে লীন হইয়া যান না।

রামানুজই সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণবধর্ম্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ মনীষার অধিকারী ছিলেন। এই মনীষার বলেই তিনি অন্যান্য মতবাদ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্করের মত খণ্ডন করিতে গিয়া রামানুজকেও প্রধানত যুক্তিবাদেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। রামানুজ শুধু একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন না, তীক্ষ্ণ মনীষারও অধিকারী ছিলেন। 'শ্রীভাষ্যে' তাঁহার এই মনীষার প্রমাণ রহিয়াছে।

মধ্বাচার্য্য (আঃ ১১৯৯—১২৭৮)

বেদান্তের ভাষ্যকারদের মধ্যে রামানুজের পরেই মধ্বাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বেদান্তের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন। তিনি দ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্বাচার্য্য আনন্দতীর্থ নামেও পরিচিত।

তাঁহার মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, নিমিত্ত কারণ মাত্র। শঙ্করাচার্য্য যেমন পূর্ণ অদ্বৈতবাদী, মধ্বাচার্য্য তেমনই পূর্ণ দ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণ পৃথক্। আবার ব্রহ্ম ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র। জড়ে জড়ে, জীবে জড়ে ও জীবে জীবে পূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে সদ্‌বৈষ্ণব বলা হয়। ইহাদের মতে বিষ্ণু বা নারায়ণের কার্য্য অষ্টবিধ। বিষ্ণু স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, সকল বস্তুর নিয়ন্তা ও জ্ঞানদাতা ; তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন এবং জীবের বন্ধন ও মুক্তি বিধান করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী, তিনি অন্তর্যামী। এই সম্প্রদায়ের মতে বৈরাগ্য, শাস্ত্রজ্ঞান, শরণাগতি প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকারের সাধনার দ্বারা দেহের সংস্কার নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ মানুষের নবজন্ম লাভ হয়, তখন মানুষ ভগবানের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং মুক্ত হয়।

মধ্বাচার্য্যের মতে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইনি কোথাও কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার উল্লেখ করেন নাই।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের মতে মধ্বাচার্য্যের মতবাদ খ্রীষ্টধর্ম্মের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহারা বলেন, মধ্বাচার্য্য অতিদুর্বৃত্ত লোকদিগের জন্য হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এ কথা সত্য যে, মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই অধিক।

নিম্বার্ক স্বামী (আঃ ১৪২৭-১৪৭৮)

নিম্বার্কাচার্য্য বেদান্তের অন্যতম ভাষ্যকার। তিনি দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার নাম 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ'। সিদ্ধান্তরত্ন নামক গ্রন্থে তিনি মাত্র দশটি শ্লোকে তাঁহার মতের সার সঙ্কলন করিয়াছেন।

তিনি যে মত স্থাপন করেন, তাহার নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। তাঁহার মতে শক্তি ও শক্তিমান্ যেমন পৃথক্ অথচ এক, ব্রহ্ম ও জীব তেমনই ভিন্ন অথচ অভিন্ন।

তাঁহার মতে ভক্তিই মানুষের পরম আশ্রয়। শরণাগতি ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও

গোপীগণ আমাদের উপাস্য। ভগবান ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়। তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। তিনি সচ্চিদানন্দময়। আর মানুষমাত্রেই কৃষ্ণের দাস। জীব অণু, ভগবান বিভু। জীবের কর্তব্য অনন্যচিত্তে ভগবানের সেবা এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন।

'ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ প্রকার' এ কথা নিম্বার্কও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে শান্তভাবে, দাস্যভাবে, সখ্যভাবে, প্রীতি বা বাৎসল্যের ভাবে অথবা মধুর ভাবে ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে।

তিলকাদি চিহ্নধারণ, জপমালার ব্যবহার প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের মতে অবশ্য করণীয়।

বল্লভাচার্য্য

বেদান্তের অন্যতম ভাষ্যকার বল্লভাচার্য্য যে মতবাদ স্থাপন করেন, উহাকে বলা হয় শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। তাঁহার ভাষ্যের নাম অণুভাষ্য।

বল্লভাচার্য্য বলেন, জীবমাত্রেই ব্রহ্মের অংশ। বহ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ব্রহ্ম হইতেও তেমনি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। সেই অক্ষর পুরুষ বিভু কিন্তু জীব অণু। জীবাত্মা স্বরূপত পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। তবে তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ, আর জীবে তাঁহার আনন্দাংশের প্রকাশ ঘটে নাই। জীব যখন শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন তাহার মধ্যে

আনন্দাংশের প্রকাশ ঘটে, তখন সেও ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়।

বল্লভাচার্য্যের মতে অজ্ঞানই দুঃখের কারণ। তিনি দুই প্রকারের মুক্তির কথা বলিয়াছেন। এক শ্রেণীর জীব ভগবানের সহিত সাযুজ্যলাভ করিতে চাহেন, ইঁহারা শ্রদ্ধার সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিধির অনুসরণ করেন, ইঁহাদিগকে বলা হয় মর্য্যাদামার্গী, আর এক শ্রেণীর জীব ভগবানের মাধুর্য্য ও লীলারস আস্বাদন করিতে চাহেন, ইহাঁরা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন ও তাঁহার শরণাপন্ন হন, ইঁহাদিগকে বলা হয় পুষ্টিমার্গী। পুষ্টি বলিতে বল্লভাচার্য্য বুঝিয়াছেন ভগবানের অনুগ্রহ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বল্লভাচার্য্য ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিত্য ও অপ্রাকৃত, আর তিনি সর্ব্বদাই ভক্তগণের সঙ্গে লীলারস সম্ভোগ করেন। তিনি কখনও চতুর্ভুজ, আবার কখনও বা দ্বিভুজ। গোলোকধামে রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলার কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

বল্লভাচার্য্য ভগবৎ-সেবার ছয়টি অঙ্গের কথা বলিয়াছেন, যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা বা পরিচর্য্যা, অর্চ্চনা ও স্তুতি। এই ভগবৎসেবা হইতেই জীব ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করে। আবার এই অনুগ্রহ হইতে ভগবানে প্রেমের উদয় হয়। তখন জীবের সকল দুঃখের অবসান ঘটে। জীব তখন ভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদন করে। যাঁহারা পুষ্টিমার্গী, তাঁহারা এইরূপ মুক্তিই কামনা করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাবের কিছু পরেই বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাব ঘটে। আচার্য্য শঙ্কর হইতে বল্লভাচার্য্য পর্য্যন্ত যে সকল ভাষ্যকার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—অদ্বৈতবাদী ও ভক্তিবাদী। ইহাদের একদিকে মায়াবাদী শঙ্কর, অপর দিকে অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্য্যগণ। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, প্রকাশানন্দ ও সার্ব্ব-ভৌমের সহিত বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি কোথাও রামানুজ-প্রমুখ কোন বৈষ্ণব আচার্য্যের মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন, এরূপ কথা কোন চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। মহাপ্রভু যে যুক্তির বলে আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং সনাতন গোস্বামীকে যে সকল গভীর তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, উহাদের উপর ভিত্তি করিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের নাম দিয়াছেন 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। এই মতের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্ সন্দর্ভ ও সর্ব্ব-সংবাদিনী এবং বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত বেদান্তের 'গোবিন্দ ভাষ্য' পাঠ করা উচিত। আমরা কবিরাজ গোস্বামীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অগ্নির সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের যে সম্পর্ক, সূর্য্যের

সঙ্গে কিরণের যে সম্পর্ক, শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবেরও সেই সম্পর্ক। জীব অণুচৈতন্য, ভগবান বিভুচৈতন্য, সুতরাং জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ একই কালে ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ। ভগবান অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন অথচ তাঁহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ব্রহ্ম শব্দে বৃহদ্বস্তু শ্রীভগবানকে বুঝায়। তাঁহার প্রাকৃত দেহ নাই বটে, তাই বলিয়া তিনি নিরাকার নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। অশেষ কল্যাণগুণের আকর এবং অখিলরসামৃতসিন্ধু তিনি,—তাঁহাকে যাঁহারা নির্গুণ বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। জগৎ অনিত্য বটে কিন্তু মিথ্যা নহে। মায়া ভগবানেরই শক্তি ; এই শক্তির বশেই জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস হইয়াও অনাদি কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবিমুখ হইয়া রহিয়াছে।

'কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার'॥
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ)

শ্রীভগবান গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে ও অন্তর্যামী-রূপে নিজেকে যখন প্রকাশ করেন, তখনই জীব মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব,—একই তত্ত্ব জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম, যোগীর নিকট আত্মা ও ভক্তের নিকট ভগবানরূপে প্রতিভাত হন।

'জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেমন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস'॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে একমাত্র ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়,—যাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগের পথ আশ্রয় করেন, তাঁহারা মানব-জীবনের চরম সম্পদ হইতে বঞ্চিত হন। মহাপ্রভু দৃষ্টান্তের সাহায্যে সনাতনকে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

...'শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥
(চরিতামৃত, মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই ভক্তিকে বলেন 'জ্ঞানকর্ম্মাছনাবৃত ভক্তি। তাঁহাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের যথার্থ ভাষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপমেবেদম্'। এই ভাগবতে ভগবানের লীলা বর্ণিত ও ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথার্থ মোক্ষ বলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বুঝিয়াছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভক্তির এক নূতন সংজ্ঞা দিয়াছেন। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'

ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তিই ভক্তি।
মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা'

কাহারও প্রতি পরম প্রেমের নাম ভক্তি। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর বলেন—অবিচ্ছিন্না সোৎকণ্ঠা স্মৃতির নাম ভক্তি, আচার্য্য রামানুজের মতে ভক্তি অর্থে ধ্রুবানুস্মৃতি, কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—

'হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে'

সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবনের নাম ভক্তি, আর এই সেবন 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং'।

এইরূপ ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাম্য। ভগবানে অহৈতুকী ভক্তিরূপ অপবর্গই তাঁহারা বাঞ্ছা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা—

'ন ধনং ন জনং কবিতাসুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্ম জন্মনীশ্বর ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

শ্রীচৈতন্য ও ভাগবত ধর্ম্ম

আমরা ভারতীয় সভ্যতাকে মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি যেখানে নানা নদ-নদীর জলধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে বেদে-ব্রাহ্মণে-আরণ্যকে-উপনিষদে, ধর্ম্মশাস্ত্রে-অর্থশাস্ত্রে-কামশাস্ত্রে, কাব্যে-নাটকে-সংগীতে, চিত্রবিদ্যায়-ভাস্কর্য্যে। এই সভ্যতার আকৃতি-প্রকৃতি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আকৃতি-প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের একটি মৌলিক আবিষ্কার এই যে, মানুষে মানুষে গুণগত তথা প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। আর এই পার্থক্য অনুসারেই তাঁহারা অধ্যাত্ম সাধনারও স্তরভেদ ও

প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাই ভারতের অধ্যাত্মচেতনা কোন একটি বিশেষ আদর্শ বা বিশেষ শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় নাই। ভারতের অধ্যাত্মসাধনা যুগে যুগে বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির আর একটি বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ-যোগ্য। ভারত যেমন শাশ্বত ধর্ম্মের, তেমনই যুগধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। 'কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন' অথবা 'কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'—এই কথা-গুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য এই যে, যুগভেদে সাধনার আদর্শেরও পরিবর্ত্তন ঘটে, ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রেও 'the old order changeth yielding place to new'.

বেদের সংহিতাভাগে, উপনিষদে ও পুরাণে যথাক্রমে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি ভক্তিধর্ম্মের বীজ সংহিতায় ও উপনিষদে নিহিত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে নারদ পাঞ্চরাত্র এবং বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে এই ভাগবত-ধর্ম্ম বা সাত্বত ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত ও বিবৃত হইয়াছে। এই ধর্ম্মের মূল কথা, ভগবান বাসুদেবের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ। অতি প্রাচীনকালে এই ধর্ম্ম উত্তর ভারতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই ধর্ম্মে ভগবান বাসুদেবই উপাস্য, আর তাঁহার প্রতি অনুরাগই মানব-জীবনের পরম সম্পদ।

দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়দিগের মধ্যে অতি প্রাচীন কালেই ভাগবত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যাঁহারা তামিল ভাষায় দেবতার স্তুতিমূলক পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আলওয়ার

নামে প্রসিদ্ধ। এই আলওয়ারগণ পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করেন। পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত সম্রাটগণ এই ধর্ম্মই অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, স্বয়ং নারায়ণের নিকট দেবর্ষি নারদ এই ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইবার পূর্ব্বেই যে দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্ম্মের পার্শ্বে এই ভাগবত ধর্ম্মও বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ভাগবতেই নিহিত রহিয়াছে। ভাগবত পুরাণে কথিত হইয়াছে—এই নারায়ণ ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম কলিযুগে তাম্রপর্ণ, কাবেরী প্রভৃতি নদীর দ্বারা প্লাবিত দেশসমূহে সমধিক প্রসার লাভ করিবে। যাহারা এই সকল নদীর জল পান করিবেন, ভগবান বাসুদেবের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মিবে। বাস্তবিকই আলওয়ারগণের রচিত স্তবস্তুতিতে আমরা পাই 'ভক্তি-বিলসিত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস'।

বিভিন্ন উপনিষদে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, মধুস্বরূপ। আবার উপনিষদ বলিয়াছেন, আত্মা সকল পার্থিব বস্তু অপেক্ষা, যাবতীয় উপকরণ অপেক্ষা, এমন কি, দেহ অপেক্ষাও প্রিয়। উপনিষদের এই সকল উক্তির মধ্যেই ভক্তিধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের বীজ নিহিত রহিয়াছে। অবশ্য, উপনিষদের অনেক স্থলেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে কিন্তু আবার এমন উক্তিরও অভাব নাই যাহার দ্বারা দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ সমর্থিত হয়। উপনিষদের ঋষিগণ ধ্যানে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত লইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি করিতেন। তাঁহারা

ছিলেন তত্ত্ববেত্তা ও ধ্যানরসিক,—শান্তরসের সাধনায় সিদ্ধ। পরবর্ত্তী কালে নারদ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ ভক্তিসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও প্রধানত শান্তরসাত্মক ভক্তির কথাই বলিয়াছেন। যে অহৈতুকী ভক্তির পরিণত ফল প্রেম ও ভগবানের লীলা-মাধুর্য্য-আস্বাদন, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে বিষ্ণুপুরাণে ও বিশেষত শ্রীমদ্ভাগবতে।

রামানুজই সর্ব্ব প্রথম ভাগবতধর্ম্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইজন আচার্য্যও (নাথমুনি ও যামুনাচার্য্য) পাঞ্চরাত্র-সম্মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। যামুনাচার্য্য ভাগবতধর্ম্মের পাঁচটি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, আরাধ্য দেবতার সম্মুখে জপ (অভিগমন), সাধুভাবে জীবিকা-অর্জ্জন (উপদন), দেবতাকে আহার্য্য দ্রব্য নিবেদন (ইজ্যা), শাস্ত্রপাঠ (স্বাধ্যায়) ও অনন্যমনে দেবতার উপাসনা (যোগ)। রামানুজের পরবর্ত্তী যে সমস্ত আচার্য্য বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন তাঁহারা সকলেই এই ভাগবত-ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই ভাগবত-ধর্ম্মের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীও সনাতন-শিক্ষায় এই ক্রমগুলির উল্লেখ করিয়াছেন—

'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্তের হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥

অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন 'কর্ব্বানন্দধাম'॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ)

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিবিধা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে—সগুণা বা হৈতুকী ভক্তি এবং নিগুর্ণা, অহৈতুকী বা অব্যভিচারিণী ভক্তি।

নারদ পাঞ্চরাত্রের মতে অহৈতুকী ভক্তিই প্রেম নামে অভিহিত।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ'॥

বাসুদেবে যাঁহারা ভক্তিমান্, তাঁহাদের আচরণ সাধারণ মানুষের মতন নয়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়েন। তাঁহারা প্রিয়ের নামকীর্ত্তন করেন, আর এইরূপ করিতে করিতে তাঁহাদের অন্তরে অনুরাগ উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের চিত্ত তখন প্রেমরসে দ্রবীভূত হয়। এই অবস্থায় তাঁহারা কখনও উচ্চ হাস্য করেন, কখনও ক্রন্দন করেন, আবার কখনো গান করেন, কখনও বা ক্ষিপ্ত জনের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বলা হইয়াছে—

'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ'।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলার ন্যায় মাধুর্য্য-লীলাও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবন-লীলায় উজ্জ্বল, মধুর বা শৃঙ্গাররসের দৃষ্টান্ত গোপিকাগণ, আর তাঁহাদের প্রেমের পরিপক্ক অবস্থায়ই অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের রাসবিলাস, 'প্রেমরস-পরিপাকবিলাসবিশেষাত্মকঃ ক্রীড়াবিশেষো রাসঃ'। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন, মধুর রসে সকল রসেরই বিশিষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান ; এই মধুরা রতির পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্মী বা রুক্মিণী-সত্যভামার মধ্যে নয়, বৃন্দাবন-বিলাসিনী গোপিকাগণের মধ্যে ; আবার এই গোপিকাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মহাভাবময়ী কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী শ্রীমতী রাধিকা, আর এই রাধার ভাব-কান্তিকে অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, ভাগবত ধর্ম্মের পরিপক্ক অবস্থা মধুরা রতিতে, আর ইহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায়। মধুর ভাবে ভগবানকে ভজনা করার পদ্ধতি সুফী সাধক বা খ্রীষ্টীয় অলোকপন্থী (Mystic) উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যেও দৃষ্ট হয়, বাইবেলের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত Song of Songs-কে আমরা চিরন্তন বিরহ-গীতি আখ্যা দিতে পারি। আবার মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে কবীর, দাদূ প্রভৃতি যে সকল ভক্ত ও সাধক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভগবানকে প্রিয়তমরূপে ভাবনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেম-লীলা ও দিব্যোন্মাদ-লীলার যে ছবি কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণ অঙ্কিত করিয়াছেন, পৃথিবীর কোথাও বোধ হয় তাহার তুলনা নাই।

আবার শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী শ্রীরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলাকে অবলম্বন করিয়া 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামে যে অভিনব রসশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহারই বা তুলনা কোথায়! এই গ্রন্থে তিনি যে নিপুণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমাদের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অনুসরণ করিয়াই পরবর্ত্তী মহাজনগণ পদাবলী-সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের মহাজনগণ দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়াছেন, কারণ, তখনও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বিধিবদ্ধ হয় নাই; তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া আত্মগত অনুভূতিকেই শাশ্বত রূপ দান করিয়াছেন, কেননা, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা তাঁহারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন নাই বা গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাজনের ন্যায় ধ্যানেও দর্শন করেন নাই, কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজনগণ মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের আলোক-সম্পাতে রাধাকৃষ্ণের লীলার নূতন তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া পদাবলী-সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, ভাগবত ধর্ম্মের প্রধান কথা ভগবান বাসুদেবে ভক্তি। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—জ্ঞানী ব্যক্তি অনেক জন্মের পর 'বাসুদেবই সমস্ত' এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্ল্লভ'।

যিনি ভাগবত ধর্ম্মে দীক্ষিত, তাঁহার নিকট 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্', তিনি জানেন—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ মখাঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥
(ভাগবত)

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ নবলক্ষণা ভক্তির কথা বলিয়াছেন, যথা—বাসুদেবের নাম বা গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, বাসুদেবের পাদ-সেবন, অর্চ্চন ও বন্দন, তাঁহার দাস্য এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন। গোবিন্দদাসের একটি নাম-কীর্ত্তনের পদেও এই নববিধা ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—

'শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদসেবন দাসী রে।
পূজন সখীজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে' ॥

যাঁহারা ভাগবত ধর্ম্মে দীক্ষিত, তাঁহাদের মধ্যেই এই নবলক্ষণা ভক্তি প্রকট হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হইয়াছে, পাঁচটি ভক্তি-রস মুখ্য—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে মধুরা রতির নানা প্রকার বৈচিত্র্যের উল্লেখ

করিয়াছেন। আমরা এখানে সেই সকল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রবিষ্ট হইব না। আমরা বলিয়াছি, বৃন্দাবনের গোপিকাগণ মধুর ভাবে বা কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত নায়ক বা নায়িকার পক্ষে যে পরকীয়া রতি নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয়, অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী রাধার পক্ষে সেই পরকীয়া রতিতেই রসের চরম উল্লাস ও উৎকর্ষ। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস'॥

স্বকীয়া রতিতে প্রেম বাধাবিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয় বলিয়া ইহাতে আবেগের প্রচণ্ডতা নাই, বাধাবিঘ্নকে জয় করিবার দুর্জ্জয় তপস্যা নাই। কিন্তু পরকীয়া রতি বর্ষার কূলপ্লাবিনী তটিনীর ন্যায় দুর্দ্দম বেগবতী;—ইহা লৌকিক ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি বাধাকে প্লাবিত করিয়া সাগরগামিনী নদীর মত প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। শ্রীরাধার প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা নাই, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিতেই তাঁহার জীবনের সার্থকতা, তাই তিনি গুরুজনের গঞ্জনা, লোকলজ্জা সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, পথের সকল বাধাকে তুচ্ছ করিয়া অভিসারে বাহির হইয়াছেন। বিদ্যাপতির রাধা বলিতেছেন—

'কানু-অনুরাগ বাঘ যব পৈঠল
মন-ঘন-কানন-মাঝ।
মান-গজেন্দ্র দরশন দূরে বহু
গন্ধে ভাগল করিরাজ॥

ধরম-কুরঙ্গ রঙ্গ করি ভুখল
কুল-হয় পলায়ল ত্রাসে।
ধৈরয-মেঘ দেশ তঁহি ছোড়ল
স্বামী-বরত-অজা নাশে।
পড়শীক বাক কাক সম কলকলি
ননদিনী জম্বুকী বোলে।
গুরুজন জাল মাল তঁহি ঘেরল
দুরজন নয়ান বিশালে।
নিরসন বোল ঢোল সম ঘোষই
নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।
শার্দ্দুল চিত ভীত নাহি হোয়ত
কবি বিদ্যাপতি ভণে' ॥

শ্রীমতী রাধিকা বলিতেছেন—কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগরূপ ব্যাঘ্র যখন আমার হৃদয়রূপ অরণ্যে প্রবেশ করিল, তখন আমার মানরূপ মত্ত হস্তী উহার গন্ধ পাইয়াই পলায়ন করিল, উহাকে দর্শন করা তো দূরের কথা। সেই ব্যাঘ্র (কৃষ্ণপ্রেম) আমার ধর্ম্মরূপ কুরঙ্গকে ভক্ষণ করিল ; কুলরূপ হয় অর্থাৎ অশ্ব ব্যাঘ্রের ভয়ে পলায়ন করিল, ধৈর্য্যরূপ মেঘ তো একেবারে দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সেই ব্যাঘ্র আমার স্বামিব্রত অর্থাৎ পাতিব্রত্যকেও বিনষ্ট করিল। প্রতিবেশীদের বাক্য ব্যাঘ্রের দর্শনে কাকের কোলাহলের ন্যায় ও ননদিনীর গঞ্জনা কাকের পশ্চাতে ধাবমান শৃগালের চীৎকার-শব্দের ন্যায় বোধ হইল। গ্রামে যখন ব্যাঘ্র প্রবেশ করে, তখন তাহাকে জাল দিয়া ঘিরিয়া ফেলিতে হয়, মল্লের সাহায্যে ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে

হয়। এক্ষেত্রে গুরুজনের সজাগ দৃষ্টি যেন জাল, আর দুর্জ্জনদের বিশাল নয়নের খর দৃষ্টি যেন মল্ল ;—লোকের নিন্দা বা পরিহাস ঢোলের বাদ্যের মত বোধ হইল, নিন্দা ত্রিশূলের মত বিদ্ধ করিল, তথাপি শার্দ্দূল-চিত্তে ভীতির সঞ্চার হইল না।

এখানে শ্রীমতী রাধিকা বলিতেছেন, কৃষ্ণপ্রেম তাহার অভিমান, ধর্ম্ম বা লোকাচার, কুলাচার, ধৈর্য্য, পাতিব্রত্য সকলই বিনষ্ট করিল :—প্রতিবেশীদের কঠোর বাক্য, ননদীর গঞ্জনা, গুরুজন ও দুর্জ্জনদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, লোকের নিন্দা বা পরিহাস সকলই তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গেল। যিনি এই চরাচর বিশ্বকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেন, যিনি স্বয়ং মন্মথমন্মথ, তাঁহার প্রতি যখন আমাদের গাঢ় অনুরাগ জন্মে, তখন আমরাও এমনই সহস্র বিঘ্ন বিপদকে তুচ্ছ করি, আমাদের চিত্তরূপ রাধিকা তখন দয়িতের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাত্রা করে। ইহাই পরকীয়া রতির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য। কিন্তু যতদিন আমাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা প্রবল থাকে, চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ নির্ম্মল না হয়, ততদিন গোপীপ্রেম কি বস্তু, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্পর্কে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। পরলোকগত জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌর-পদতরঙ্গিণীর' উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—'গোস্বামিগণ স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেননা, পরকীয়া প্রেমে গাঢ়তা, মাদকতা ও তন্ময়তা অধিকতর। গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ, উহা নিষ্কাম। ব্রজবধূগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ-মানসে বনে বনে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের

অন্বেষণ করিতেন। গোপীগণ যে অঙ্গরাগ প্রভৃতি করিতেন, তাহাও ভগবানের সন্তোষবিধান-নিমিত্ত,—নিজের সুখের জন্য নহে। এই জন্যই পূজ্যপাদ গোস্বামিগণ গোপিকার প্রেমকে কামগন্ধহীন বলিয়া বারংবার বর্ণনা করিয়াছেন'।

যাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের মত উত্তমাধিকারী, যাঁহারা 'রাগানুগা মার্গে' শ্রীভগবানের সেবা করিয়া সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই গোপীপ্রেমের এবং গোপিকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকার প্রেমের মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী যে অপ্রাকৃত রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার মূল প্রেরণা ছিল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভাবাবেশময় দিব্য জীবন। মর্ত্ত্যলীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভু জীবনে নিরন্তর যে কৃষ্ণবিরহ অনুভব করিতেন, যে বিরহে তাঁহার রোমকূপে রক্তোদ্গম হইত, অঙ্গসমূহে ভাব-কদম্ব বিকশিত হইত, ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময় বাদের মধ্য দিয়া যে বিরহ অভিব্যক্ত হইত অর্থাৎ উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি দশার মধ্য দিয়া যে বিরহ প্রকট হইত, কবিরাজ গোস্বামী সেই বিরহের এক অপূর্ব্ব ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এ সেই বিরহ, যে বিরহের মধ্য দিয়া শ্রীমতী রাধিকার জীবনে রূপান্তর ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ—এই দ্বিবিধ শৃঙ্গারের উল্লেখ থাকিলেও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বা বিরহেরই উৎকর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্ত কবীর বলিয়াছেন—

'কবীর বিরহ বিনা তন্ শূন্য হায় বিরহ হায় সুলতান।
যো ঘট বিরহ না সঞ্চরে সো ঘট জন্ম মশান'॥

হে কবীর, বিরহ ভিন্ন দেহ শূন্য, বিরহই এই দেহের রাজা ; যে ঘটে বিরহ সঞ্চারিত হয় না, সে ঘট মশানতুল্য।

বাস্তবিক, মিলনে আমরা যাহাকে একান্ত ভাবে কাছে পাই, বিরহে তাহাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিই নিখিল ভুবনে ; এই জন্যই বিরহের গীতিতে সর্ব্বদাই একটা অতীন্দ্রিয় সুর ধ্বনিত হইতে থাকে। অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা উভয়েই বিরহরূপ তপস্যার মধ্য দিয়া রূপান্তর বা নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন ; এই জন্যই মনীষী চন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন— 'দুর্ব্বাসার অভিশাপ শকুন্তলা নাটকের প্রধান ঘটনা'। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারিটি শ্রেণীভেদ আছে, যথা— পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। মিলনের পূর্ব্বে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি হইতে যে রতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে পূর্ব্বরাগ। পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীমতী রাধার পূর্ব্বরাগের কারণ কোথাও সাক্ষাৎ দর্শন, কোথাও বা স্বপ্নে দর্শন, কোথাও চিত্রপটে দর্শন, কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণ, কোথাও দূতীমুখে বা সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির কথা শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার যে রতি, উহা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা-শূন্যা ; কৈতবরহিতা, অহৈতুকী,—উহাকে বলা হইয়াছে প্রৌঢ়া রতি। এই প্রৌঢ়া রতির দশটি দশার কথা অলঙ্কার-শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

'লালসোদ্বেগজাগর্য্যাস্তানং ন জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদ মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥'

অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার নাম লালসা। উদ্বেগ বলিতে বুঝায় মনের চঞ্চলতা। জাগর্য্যা অর্থে জাগরণ

বা নিদ্রার অভাব, তানব অর্থে তনিমা বা অঙ্গের কৃশতা। যাহাতে ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞান এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তির লোপ হয়, তাহাকে বলে জড়িমা। বৈয়গ্র্য কথাটির অর্থ ভাবের গভীরতা-জনিত তীব্র ও অসহনীয় বিক্ষোভ। ব্যাধি বলিতে বায়ু, পিত্ত বা কফের বিকৃতি বুঝায় না, ইষ্টলাভের অভাবে দেহের যে পাণ্ডুতা ও গ্লানি, উহাকেই বলে ব্যাধি। উন্মাদ বলিতে বুঝায় শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তাহেতু ভ্রান্তি। মোহ অর্থে চিত্তের বিপরীত গতি। আর মৃত্যু অর্থে মরণের উদ্যম। যদি দূতীপ্রেরণ এবং প্রেম-নিবেদন সত্ত্বেও কান্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলেই এইরূপ অবস্থা ঘটে।

নায়কের অদাক্ষিণ্যহেতু নায়িকার মনে যে বামতা বা প্রতিকূলতা জন্মে, তাহাকে মান বলা হয়। কিন্তু নায়িকার প্রতিও নায়কের মান হইতে পারে। সাধারণত কোন হেতুকে আশ্রয় করিয়াই নায়িকার মনে মান উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কখনও কখনও বিনা কারণেও অর্থাৎ মানের সঙ্গত কারণ না থাকিলেও নায়িকা নায়কের প্রতি মানিনী হইয়া থাকে। নায়কের চিত্তেও নায়িকার প্রতি মান জন্মিতে পারে। জয়দেবই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্যে 'মানের' চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রাধার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্' অথবা 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্ দেহি পদপল্লবমুদারম্' আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-লীলার অধ্যাত্ম ব্যাখ্যার পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিবেন, যিনি শ্রীভগবানের

জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন, ভগবান স্বয়ং তাহার চরণ মস্তকে ধারণ করেন অর্থাৎ তাহার বশীভূত হন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের তাৎপর্য্য।

প্রেমবৈচিত্ত্য বলিতে বুঝায় মিলনের মধ্যেও বিরহের অনুভূতি। যাহাকে আমরা বিরহ বলি, তাহা প্রকৃত পক্ষে অন্তর্মিলন। আবার মিলনের মধ্যেও বিরহের অনুভূতি জাগিয়া থাকে, ইহাকে বলে প্রেমবৈচিত্ত্য। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়-দেশে অবস্থান করিতেছেন, অথচ কাতর হইয়া বলিতেছেন, কানু আমার কাছে নাই, তিনি বিদেশে গিয়াছেন, এই অবস্থা প্রেমবৈচিত্ত্যের অবস্থা।

নায়কের অন্যত্র গমনে নায়িকার যে বিরহ, পদাবলী-সাহিত্যে সেই বিরহ-বর্ণনার প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। নায়িকার স্থানান্তর-গমনের উল্লেখ পদাবলী-সাহিত্যের কোথাও দেখা যায় না, নায়কের স্থানান্তর-গমনকেই বলা হয় 'প্রবাস'। শ্রীকৃষ্ণ যখন সখাগণের সঙ্গে গোচারণে গমন করেন, অথবা অন্য কোন কারণে স্বল্পকালের জন্য অন্তর্হিত হন, তখন গোপীগণের সঙ্গে তাঁহার যে স্থানান্তরের ব্যবধান, তাহাকে বলা হয় অদূর প্রবাস। আবার শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘদিনের জন্য মথুরায় গমন করিলে তাঁহার বিরহে বৃন্দাবনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, এই অবস্থায় ব্রজ-বধূগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের এই যে দূরদেশে গমন, ইহাকেই বলে সুদূর প্রবাস। এই অবস্থায় কৃষ্ণবিরহে ব্রজবধূগণের তো কথাই নাই, বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমও শোকাচ্ছন্ন, ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এ যুগের

একজন কবিও এই বিরহার্ত্ত বৃন্দাবনের ছবি নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সম্ভোগেরও নানা বৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নায়কশ্রেষ্ঠ, তাঁহার রূপ, গুণ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের তুলনা নাই। তাঁর 'বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম, প্রাণী অশ্রু বহে পুলক, কম্প, ধার'। আর শ্রীমতী রাধিকা নায়িকাশিরোমণি, তিনি রূপে ও সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যময়ী, আর তাঁহার গুণের বর্ণনায় বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা কোন বিশেষণই অবশিষ্ট রাখেন নাই। অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়িকার অষ্ট অবস্থার বর্ণনা আছে (ইহাদের প্রত্যেকের আবার আটটি ভেদ রহিয়াছে), যথা—অভিসারিকা, বাসক-সজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা। শ্রীমতী রাধার মধ্যে আমরা এই আট প্রকার অবস্থাই দেখিতে পাই। রাধা যখন কান্তার্থিনী হইয়া অভিসারে গমন করেন, তখন তিনি অভিসারিকা, যখন প্রিয়ের আগমনের অপেক্ষায় নিজ দেহ ও কুঞ্জ সজ্জিত করেন, তখন বাসকসজ্জিকা, যখন কান্তের আগমন বিলম্বিত হয়, তখন তিনি উৎকণ্ঠিতা, কান্ত কেন সঙ্কেতস্থানে আসিলেন না, এই চিন্তায় যখন রাধিকা খিন্না, তখন তিনি বিপ্রলব্ধা, যখন নায়কের অঙ্গে সম্ভোগের চিহ্নদর্শনে কোপযুক্তা, তখন তিনি খণ্ডিতা, যখন প্রিয়-প্রত্যাখ্যানের পর প্রিয়ের অদর্শনে অনুতপ্তা, তখন তিনি কলহান্তরিতা, কান্ত যখন প্রবাসে গিয়াছেন, তখন তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা, আর কান্তকে যখন সর্ব্বদা

নিজের বশীভূত বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন স্বাধীন-ভর্তৃকা।

প্রাক্-চৈতন্য যুগের যে সকল মহাজন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা শুধু আত্মগত অনুভূতিকেই প্রকাশ করেন নাই, তাঁহাদের রচনার মূলে ছিল একটা সমষ্টিগত ঐতিহ্য। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে রাধা-কৃষ্ণের লীলা এক নূতন তাৎপর্য্য লাভ করিল। বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীর প্রভাবে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের মনে এই প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমতী রাধার ভাবকান্তি লইয়া নিজ রস আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং যখনই তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই রাধাভাবে বিভাবিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের চম্পকনিন্দিত প্রেমাবেশবিহ্বল মূর্ত্তিখানি তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্মেও অধিকার-ভেদ আছে। স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই অধিকারভেদের কথা স্বীকার করিয়াছেন। বৃন্দাবনের গোপিকাগণের রতি রাগাত্মিকা, কিন্তু আমরা যদি বৃন্দাবনের কোন ভাব অবলম্বন করিয়া রাগানুগ মার্গে ভগবানের ভজনা করিতে পারি, তবেই আমাদের জীবন ধন্য হইতে পারে। আবার বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি লাভের উপায় বলিয়া ইহারও প্রয়োজনীয়তা অল্প নয়। বৈধী ভক্তির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে নামে রুচি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়। নামে রুচি হইতে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে প্রেমের সঞ্চার হয়, 'শিক্ষাষ্টকে' তাহার ইঙ্গিত আছে। এই শিক্ষাষ্টক মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী,

কথামৃত, তাঁহারই শ্রবণমঙ্গল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অতিশয় দৃঢ়তার সহিত একথা প্রচার করিয়াছেন যে, কলিকালে সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতে হইবে, সনাতনকে তিনি উপদেশ দিয়াছেন—

'সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥
এই পঞ্চমাঝে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়' ॥

নীলাচলে অবস্থিতিকালে তিনি নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে নাম-প্রচারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, আর স্বয়ং জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর নিজের মধ্যে বিরহিণী রাধার আর্ত্তি অনুভব করিয়া দিব্যোন্মাদের অবস্থায় কাল যাপন করিয়াছেন, 'তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের ন্যায়' বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। শিক্ষাষ্টক যেন মহাপ্রভুর জীবনের সূত্রস্বরূপ, আর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' তাঁহার জীবনের ভাষ্যস্বরূপ। শিক্ষাষ্টকে নামের মাহাত্ম্য এবং নাম ও নামীর অভিন্নত্বের কথা, নামগ্রহণের অধিকারী বৈষ্ণবের লক্ষণ, অহৈতুকী ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। শ্রীভগবানের দাস্য ও সেবা এবং দৈন্য, আর্ত্তি ও শরণাগতির মধ্য দিয়াই যে আমরা ভগবানের মহতী কৃপা লাভ করিয়া থাকি, সে কথাও শিক্ষাষ্টকে উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের সহিত মিলনের জন্য ভক্তের তীব্র আকুতি বা উৎকণ্ঠা এবং ভগবদ্বিরহে ভক্ত-হৃদয়ের তীব্র বেদনা শিক্ষাষ্টকে

অনন্নুকরণীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণেই প্রেমের সার্থকতা, শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে এই আত্ম-নিবেদনের কথা যেরূপ অনবদ্য ভাষায় বলা হইয়াছে, তাহাতে রাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর উজ্জ্বল ছবিটি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে নামের মাহাত্ম্য এই ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

> 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
> শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
> আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
> সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'॥

শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক। মানুষের চিত্তরূপ দর্পণকে ইহা মার্জ্জিত করে, নামের গুণে সংসাররূপ মহাদাবানল চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়। মঙ্গলরূপ শ্বেতপদ্মের পক্ষে এই নাম যেন ধবল চন্দ্রিকা, ব্রহ্মবিদ্যারূপ বধূর ইহা প্রাণ-স্বরূপ। আনন্দসমুদ্রকে উদ্বেল করে এই নাম, ইহার প্রতি পদে আছে পরিপূর্ণ অমৃতের আস্বাদন। এই নাম পরমানন্দ-রসে অবগাহন করায় মানুষের আত্মাকে।

প্রথমে চাই নামে রুচি, তারপর জন্মে নামসংকীর্ত্তনের অধিকার। সকলের পক্ষে নামে রুচি স্বাভাবিক নয়। নামে যাঁহার রুচি জন্মিয়াছে, তিনিই ভাগ্যবান। তাই আমাদিগকে কাতরহৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহাতে নামে আমাদের

রুচি জন্মে। আমাদিগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতঃ নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ' ॥

হে ভগবন্, তুমি তোমার সর্ব্ব শক্তি অর্পণ করিয়াছ তোমার নামে, হে দয়াময়, তোমার নামগ্রহণের কালাকালও নির্দ্দিষ্ট কর নাই, তথাপি এমনই আমার দুর্দ্দৈব যে তোমার নামে আমার অনুরাগের সঞ্চার হইল না।

নামগ্রহণের অধিকার কিন্তু সহজ অধিকার নয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ এই—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' ॥

তৃণের চাইতে সুনীচ ও বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হইয়া, অপরকে যথাযোগ্য সম্মান দান করিয়া কিন্তু স্বয়ং অমানী হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত ভগবানের নিকট কোন অনিত্য পার্থিব বস্তুরই কামনা করেন না। তিনি কামনা করেন অহৈতুকী ভক্তি। হরিনাম-কীর্ত্তনের অধিকারী হইলে আমাদের হৃদয়ে ধীরে ধীরে অহৈতুকী ভক্তির সঞ্চার হয়। মহাপ্রভু প্রার্থনা করিতেছেন—

'ন ধনং ন জনং সুন্দরী-কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মদি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি' ॥

হে জগৎপতে ! আমি তোমার নিকট ধন, জন, বা মনোমোহিনী কবিত্ব-শক্তি,—এ সবের কিছুই প্রার্থনা করি না। আমার শুধু এই প্রার্থনা, তোমার প্রতি যেন জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়।

কিন্তু এই অহৈতুকী ভক্তিকে লাভ করিতে হইলে তো তাঁহার কৃপার প্রয়োজন। তাঁহার কৃপালাভের উপায় কি ? যিনি দৈন্য ও আর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া দাস্যভাবে ভগবানের ভজনা করেন, ভগবৎ-কৃপা তাঁহার পক্ষেই সুলভ হয়। মহাপ্রভু প্রার্থনা করিতেছেন—

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

হে নন্দনন্দন ! আমি তোমার কিঙ্কর, তোমাকে বিস্মৃত হইয়া বিষম ভব-সাগরে পতিত হইয়াছি। আমায় কৃপা করিয়া তোমার পাদ-পঙ্কজের ধূলিকণা করিয়া রাখ।

ভগবানের প্রতি যখন আমাদের অনুরাগ জন্মে তখন আমাদের দেহে অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়। এই অবস্থা ভক্তগণের একান্ত কাম্য, ভগবানে অনুরাগ যখন আমাদের গাঢ় হয়, তখনই আমাদের মধ্যে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেছেন—

'নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি' ॥

কবে তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমার নয়নদ্বয়ে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইবে ? ভাবাবেগে বদনে গদ্গদ ভাষা

নির্গত হইবে আর আমার এই বপু পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে ?

ভগবানে গাঢ় অনুরাগের একটি লক্ষণ এই যে, তিলেকের জন্যও তাঁহার বিচ্ছেদ আমাদের নিকট অসহনীয় বলিয়া বোধ হয়। এই অনুভূতি অবশ্য প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার জীবনেও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ভগবদ্বিরহের অনুভূতিতে যে তীব্রতা, যে মাধুর্য্য, যে মাদকতা, যে তন্ময়তা বর্ত্তমান, তাহার একটি কণাও প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা আস্বাদন করিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে'॥

গোবিন্দ-বিরহে আমার নিকট একটি নিমেষ একটি যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, চক্ষু হইতে প্রাবৃটের ধারার মত অশ্রু পতিত হইতেছে, নিখিল জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির কামনা নাই, আছে শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা, আছে কৃষ্ণপদে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। 'তোমার যাহা ইচ্ছা, তুমি তাহা করিতে পার, আমাকে তুমি কান্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে পার, অথবা আমাকে বঞ্চিত করিয়া দূরেও সরিয়া যাইতে পার, কিন্তু আমি জানি, আমার হৃদয়-বল্লভ একমাত্র তুমিই, অপর কেহ নহে'—প্রেমের পরিপক্ক অবস্থায় ভক্ত এই অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ'॥

হে দয়িত ! তোমার ইচ্ছা হয়, আমায় আলিঙ্গন করিও, অথবা চরণতলে পিষ্ট করিও, কিংবা দেখা না দিয়া আমায় মর্ম্মাহত করিও। হে লম্পট! যাহাতে তোমার সুখ জন্মে, তুমি তাহাই করিও। কিন্তু আমি জানি, আমার প্রাণনাথ একমাত্র তুমিই, অপর কেহ নহে।

শিক্ষাষ্টকের শেষ দুইটি শ্লোক আমাদিগকে মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধার বিরহ ও শ্রীকৃষ্ণের চরণে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্রেমের তপস্যার এইখানেই পরিপূর্ণ সিদ্ধি, ভাগবত-ধর্ম্মের ইহাই পরিপক্ক অবস্থা। এ অবস্থায় আছে শুধু মাধুর্য্যের আস্বাদন, 'বাহিরে বিষের জ্বালা' হইলেও অন্তরে বিরাজ করে সেই আনন্দের অনুভূতি, যে আনন্দকে প্রকাশ করিবার মত ভাষা মানুষের নাই। মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন—

'সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতী সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈববৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর॥'

(চৈতন্যচরিতামৃত,—মধ্যলীলা, একবিংশ পরিচ্ছেদ)

প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের পদাবলী সাহিত্য

দ্বাদশ শতাব্দীতে বিলাস-কলা-কুতূহলী জয়দেব গোস্বামী যে মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধির ছটায় যে পদাবলীতে অভিনব সৌন্দর্য্য ও দীপ্তির সঞ্চার হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের প্রেরণায় সেই পদাবলী-সাহিত্যই শব্দৈশ্বর্য্যে, ছন্দোবৈচিত্র্যে ও ভাব-সম্পদে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে একদিকে যেমন প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা অপরিহার্য্য, অন্যদিকে তেমনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-দর্শন ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বা অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত পরিচয়ও অত্যাবশ্যক। এইজন্যই, ষোড়শ শতকের পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এবার প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের পদাবলী-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল প্রেরণা কবির আত্মগত ভাব বা অনুভূতি নয়, সমষ্টিগত সাধনা ও ঐতিহ্য। এইখানেই আধুনিক গীতি-কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রধান পার্থক্য। এ যুগে যিনি গীতি-কবিতার রচয়িতা, তিনি আত্ম-গত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আনন্দ-বেদনাকে

রসরূপ দান করেন, ফলে উহা বিশ্বজনীনতা লাভ করে। কিন্তু বৈষ্ণব গীতিকবিতার মূল উৎসের সন্ধান করিতে হয় সমষ্টিগত সাধনার ধারার মধ্যে। এইজন্য পদাবলী-সাহিত্যে যাঁহারা নিছক সাহিত্যরস আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা পদকর্ত্তার উপর সুবিচার করেন না। আর এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী পুরুষও জয়দেবের কাব্য আলোচনা করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে জয়দেব শুধু একজন বিদগ্ধ ও কলাকুশলী কবি, তাঁহার কাব্যে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে কিন্তু ভারতীয় বৈষ্ণব সাধকের দৃষ্টিতে জয়দেব রাধাকৃষ্ণের লীলার প্রত্যক্ষদর্শী মহাজন। মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক জয়দেবের পদ আস্বাদিত হইবার বহু পূর্ব্বেই গীতগোবিন্দ যে নিখিল ভারতে অপরিসীম মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল, সে শুধু ইহার কাব্য-গুণে নয়, জয়দেব ভক্ত কবি বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিলেও জয়দেব কোন কোন স্থলে অপভ্রংশের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর তিনি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, বিশেষতঃ বড়ু চণ্ডীদাস ও চৈতন্যোত্তর যুগের গোবিন্দদাস কবিরাজের উপর জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন শারদীয় রাসের চিত্তচমৎকারী বর্ণনা রহিয়াছে, গীতগোবিন্দে তেমনই বাসন্ত রাসের শ্রবণমনোহারী বর্ণনা আছে। ভাগবতে রাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, তবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে উহাতে রাধার সম্পর্কে ইঙ্গিত

রহিয়াছে। (অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।) কিন্তু জয়দেব তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ-কেলয়ঃ'। ভাগবতে গোপীদিগের মানের কথা নাই, কিন্তু জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রাধিকার মানভঞ্জনের অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার চরিত্রকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এইখানেই পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে জয়দেবের সাধর্ম্ম্য। জয়দেব প্রধানত সম্ভোগ-শৃঙ্গারের কবি, —বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার যেমন সহজে মানুষের মনকে অতীন্দ্রিয় লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, সম্ভোগ-শৃঙ্গারের পদ সেরূপ করে না। বিশেষত, এই জাতীয় পদে প্রাকৃত জগতের ভাষায় অপ্রাকৃত জগতের লীলা-বিলাস বর্ণনা করিতে হয়, এইজন্য যাঁহারা 'গীতগোবিন্দকে' শুধু সাহিত্য-হিসাবে বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে জয়দেব শুধু সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের কবি। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মহাজন বিদ্যাপতি কিন্তু বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের পদও রচনা করিয়াছেন, তিনি শুধু জয়দেবের মত সম্ভোগ শৃঙ্গারের বর্ণনা করেন নাই। বিদ্যাপতির বিরহ বা ভাব-সম্মেলনের পদ যে অনুভূতির নিবিড়তায় আমাদিগকে মুগ্ধ করে, এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা চলে। চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজনেরা এই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকেই বিশেষ প্রাধান্য দান করিয়াছেন, এই দিক্ দিয়াই জয়দেবের সঙ্গে পরবর্ত্তী কালের মহাজনগণের প্রধান পার্থক্য। কিন্তু বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধকের দৃষ্টিতে জয়দেবও অপরাপর মহাজনের ন্যায়ই গৌরবের অধিকারী। আর স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে তুল্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাস-বিরচিত নানা খণ্ডে বিভক্ত লীলা-কাব্যের আবিষ্কারের পর সাহিত্য-জগতের একটি অনাবিষ্কৃত প্রদেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু প্রধানত এই পরিচয়ের ফলেই জটিল চণ্ডীদাস-সমস্যারও উদ্ভব হইয়াছে। মনীষী বসন্তরঞ্জন রায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এই কল্পিত নামে পুঁথিখানির সম্পাদনা করিয়াছেন। (আমরাও এই নামেই গ্রন্থখানিকে অভিহিত করিব।) ভাষাতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্ববিদ্‌গণ পুঁথিখানির রচনা-কালও লিপি-কাল নির্ণয়ের জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং নানা মতবিরোধ সত্ত্বেও গ্রন্থখানি যে প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত হইয়াছিল, সেবিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রায় একমত হইয়াছেন। অবশ্য, এই খণ্ডিত পুঁথিখানি একই কবির এবং একই যুগের রচনা কিনা, আভ্যন্তরীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সে প্রশ্নেরও মীমাংসা করা আবশ্যক। তথাপি, এ কথা স্বীকার করা অযৌক্তিক হইবে না যে, প্রাক্-চৈতন্য যুগে চণ্ডীদাস নামে অন্তত একজন কবি লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই পদাবলীর রচয়িতা নিতান্ত কাব্যগুণবর্জ্জিত ছিলেন না, রসসৃষ্টিতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল ; আবার নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র অঙ্কনেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তিনটি মাত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া যে কবি এরূপ একটি বিচিত্র আখ্যান-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ কবির মর্য্যাদা দাবী করিতে পারেন। তথাপি, যে চণ্ডীদাস দীর্ঘ কাল যাবৎ বাঙ্গালীর হৃদয়-আসনে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যে চণ্ডীদাসের সম্পর্কে 'হৃদে ভাব ওঠে, মুখে ভাষা

ফোটে' এই উক্তি সম্পূর্ণ সার্থক, যাঁহার পদাবলী শিল্পৈশ্বর্য্য-বর্জ্জিত হইয়াও আমাদের মর্ম্ম গভীরভাবে স্পর্শ করে, যাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে পাই অনির্দ্দেশ্যের ব্যঞ্জনা, সেই চণ্ডীদাসের সঙ্গে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যুক্তি অপেক্ষা ভাবালুতাকেই অধিকতর প্রশ্রয় দেন। ভাষাগত পার্থক্য, বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা, রসোপলব্ধির পদ্ধতিগত অনৈক্য প্রভৃতি হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের' রচয়িতা ও পদাবলীর রচয়িতা এক ব্যক্তি নহেন। (দুইটি অনুমান (Hypothesis) যেখানে একই কালে সত্য হইতে পারে না, সেখানে যেটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত (more probable hypothesis) সেটি গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য)।

তারপর, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন—নীলাচলে অবস্থিতি-কালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কোন্ চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন ? এ বিষয়েও অধিকাংশ বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বসন্ত বাবু প্রভৃতি মনীষীদের সিদ্ধান্তের অনৈক্য দেখা যায়। চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইলেও আজও শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তিগণ সমষ্টিগত ভাবে গ্রন্থখানিকে কোন স্বীকৃতি বা মর্য্যাদা দান করেন নাই। তাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় একখানি রসাভাস-দুষ্ট ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ গ্রন্থ মহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। পক্ষান্তরে, এ যুগের অনেক পণ্ডিত এ কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব সাধক ও মহাজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলেও

স্বয়ং মহাপ্রভু সংস্কারমুক্ত মন লইয়াই কাব্যখানির আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে অশ্লীলতার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কেননা, তিনি শিলাভট্টারিকা-রচিত প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের একটি শ্লোকের মধ্যেও সুগভীর অধ্যাত্ম তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আর রস-আস্বাদন-ব্যাপারেও তিনি পরবর্ত্তী কালে রচিত অলংকার-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করেন নাই, নির্ভর করিয়াছেন আপন অন্তরের অনুভূতির উপর। এই শ্রেণীর সমালোচকগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পর্কে ভক্ত বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি-প্রসূত বলিতে ইতস্তত করেন নাই ; কিন্তু 'স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রস আস্বাদন করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন অখণ্ডনীয় যুক্তি উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রসাভাস-দুষ্ট বা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কোন কাব্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন না। জয়দেব বা বিদ্যাপতির পদাবলী যে শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিতেন, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। যদি আধুনিক পণ্ডিতের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে শ্রীচৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা দান করিলেও আলঙ্কারিকগণ রসাস্বাদন-পদ্ধতিকে কৃত্রিম বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া চণ্ডীদাসকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তবে প্রশ্ন করিতে হয়—

(ক) জয়দেব বা বিদ্যাপতির পদাবলী যখন বৈষ্ণব আস্বাদন-পদ্ধতির অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তখন একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যকে তাঁহারা বর্জ্জন করিয়াছিলেন কেন ?

(খ) শ্রীরূপ গোস্বামীর দৃষ্টিতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু 'রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু' ; রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াই তো নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এরূপ ক্ষেত্রে যদি সত্যই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিতেন, তাহা হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী কি তদনুরূপ রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন না ?

(গ) শ্রীরূপ গোস্বামীর অলংকারশাস্ত্র কি তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত ? প্রাক্তন পদাবলী-সাহিত্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য জীবন হইতেই কি তিনি প্রধানতঃ রসশাস্ত্র প্রণয়নের প্রেরণা লাভ করেন নাই ?

(ঘ) বৈষ্ণব রসাস্বাদনপদ্ধতি কি তাঁহাদের সাধনপদ্ধতির সঙ্গে অভিন্ন নয় ?

(ঙ) প্রাক্‌-চৈতন্য যুগেও কি বিল্বমঙ্গল, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ রসাস্বাদন-পদ্ধতিকে সাধন-পদ্ধতি হইতে অভিন্ন করিয়া দেখেন নাই ?

(চ) যদি প্রাক-চৈতন্য যুগেও বৈষ্ণবগণের মধ্যে রসাস্বাদনের কোন গুরুপরম্পরাগত পদ্ধতি থাকে, তবে সে পদ্ধতি কি চৈতন্যোত্তর যুগের আস্বাদন-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ?

(ছ) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কি সহজিয়াগণের সাধনার কোন প্রভাব নাই ? ইহার কোথাও কি চর্য্যাপদের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয় নাই ? আর যে গ্রন্থে সহজিয়া প্রভাব বর্ত্তমান সে গ্রন্থ কি মহাপ্রভুর পক্ষে আস্বাদন করা স্বাভাবিক ?

সনাতন গোস্বামী অবশ্য 'বৈষ্ণব-তোষণী' টীকায় 'চণ্ডীদাসাদির প্রদর্শিত' দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে কিছু প্রমাণিত হয় কি ? 'রাধাপ্রেমামৃত' নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে সম্পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন কাব্য আছে, তাহাতেও দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনা রহিয়াছে। কে জানে, এই কাব্যের রচয়িতা চরিত-সাহিত্যে উল্লিখিত চণ্ডীদাস কি না ! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলীর চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে—ইহাতে 'বহু স্থলেই উৎকৃষ্ট কাব্য রহিয়াছে, কবি শক্তিমান্। ইহার নাম যে কি, তাহা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। প্রাচীনত্বের প্রমাণ গ্রন্থ-মধ্যে বিদ্যমান। ইনি সনাতন গোস্বামি-রচিত 'বৈষ্ণব-তোষণী'র চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির চণ্ডীদাসও হইতে পারেন, আবার 'আদি'-দেরও কেহ হইতে পারেন। বড়ুর বাংলা খণ্ড সংস্কৃত টীকাকার ও আজীবন সংস্কৃত-লেখক সনাতনের লক্ষ্য না হওয়াই স্বাভাবিক'।

বসন্তবাবু 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের' ভূমিকায় কাব্যখানির জীবন্ত সমাধি ঘটিবার একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা সুপ্রাচীন, এবং উহার ভাব-ধারা, রস-পর্য্যায়, আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনা গৌড়ীয় গোস্বামি-আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং পরবর্ত্তী গোস্বামি-শাসিত সমাজে তাদৃশ কাব্য বিরল-প্রচার না হইয়া পারে না। মহাপ্রভু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের কথা স্বতন্ত্র, কেন না, তাঁহারা

সম্প্রদায়ের বহু উর্দ্ধে। কালবশে কাব্যখানার জীবন্ত সমাধি ঘটে কিন্তু কবি-যশ অম্লান রহিয়া যায়'।

সম্পাদক মহাশয় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলিতে কাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন? মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায় অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ; কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদর কেহই রসাভাস বা সিদ্ধান্ত-বিরোধ-রূপ দোষকে উপেক্ষা করিতে পরিতেন না।

'রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥' ইত্যাদি
(অন্ত্যলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

চৈতন্য-চরিতামৃতের এই অংশটিকে যাঁহারা প্রমাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, মহাপ্রভু বা স্বরূপ দামোদর কাহারও পক্ষেই বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে' স্বীকৃতি দান করা সম্ভব নহে। উজ্জ্বলনীলমণি-প্রণেতা শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পক্ষে তো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাই স্বাভাবিক, আর সনাতন গোস্বামী তাঁহার টীকায় চণ্ডীদাসের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ করিলেও তিনি যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে প্রমাণাভাব।

তারপর, সম্পাদক মহাশয় 'সাম্প্রদায়িকতা' বলিতে কি বুঝিয়াছেন? বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে রসাস্বাদন ব্যাপারটি একটি সুনির্দ্দিষ্ট সাধনা, যদি কোন গ্রন্থ এই সাধনার প্রতিকূল বলিয়া বর্জ্জিত হয়, তবে কি আমরা তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় পাই?

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' যে সমস্ত কারণে বৈষ্ণব আদর্শ ও ঐতিহ্যের বিরোধী তাহার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মহাভাবময়ী রাধা লক্ষ্মীর অবতাররূপে কল্পিত হইয়াছেন, ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিরোধী। একমাত্র নায়িকাশিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি, লক্ষ্মীর প্রেম ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত, উহাতে ব্রজবধূগণের পরকীয়া রতির দুর্দ্দমনীয়তা বা আত্মবিস্মৃতি নাই, আবার গোপিকাগণের মধ্যে রাধা গুণের উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা। লক্ষ্মী বা রুক্মিণী-সত্যভামার রতির সঙ্গে শ্রীমতী রাধিকার রতির পার্থক্য চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) পদাবলী-সাহিত্যে সর্ব্বত্রই শ্রীমতী রাধিকার পূর্ব্বরাগ প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' দেখিতে পাই, বড়াইর মুখে রাধার রূপের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েই প্রথমে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দ্দেশ এই—

'অপি মাধবরাগস্ত প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্যাচ্চারুতাধিকা'॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথম সঞ্জাত হইলেও মৃগলোচনাগণের প্রথম পূর্বরাগের বর্ণনায়ই চমৎকারিত্বের আধিক্য ঘটিয়া থাকে।

(৩) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যের বিরোধী। শ্রীরূপ গোস্বামীর মতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সীগণের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠা এবং ইহাদের উভয়ের মধ্যে রাধিকা গরীয়সী।

(৪) শ্রীমদ্ভাগবতে কালীয়দমন ও বস্ত্রহরণের পর রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই রসের আস্বাদন-পদ্ধতি। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী, তাঁহারাও এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্যের তাৎপর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাসলীলার পর কালীয়দমন ও বস্ত্রহরণ বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) আমরা স্বীকার করি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্তত একটি পদ অনুভূতির নিবিড়তায় ও ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতায় যে-কোন শ্রেষ্ঠ পদের সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে। সর্ব্বজন-পরিচিত সেই পদটি—

'কে না বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী-নই-কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়াই এ গোঠ-গোকুলে'॥

একদিন মনীষী রামেন্দ্র সুন্দরকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু মালাধর বসু যে বংশীনাদের কথা বলিয়াছেন, অথবা জ্ঞানদাস যে বংশীশিক্ষার পদ রচনা করিয়াছেন, এ বংশী যে সে বংশী নয়, তাহার প্রমাণও গ্রন্থমধ্যেই রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রাধিকা নিদ্রিত কৃষ্ণের বংশী হরণ করিলে তিনি হৃত বংশীর জন্য বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার বংশীটি যে ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত, এ কথার উল্লেখও তিনি করিয়াছেন। যাঁহার বেণুধ্বনি শুনিলে স্থাবর-জঙ্গম মোহিত হয়, তিনি প্রাকৃত জনের ন্যায় পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে গুরুতর রসাভাস-দোষ ঘটিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই সকল

গুরুতর রসাপকর্ষক দোষ থাকা সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় একজন রসগ্রাহী পণ্ডিত ব্যক্তি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। 'পদাবলী-পরিচয়ে' তিনি লিখিয়াছেন, 'দ্বিজ চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি যাঁহারা অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, 'দ্বিজ চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসেরই অভিনব সংস্করণ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর করুণাস্নানে জাতির যেমন জন্মান্তর ঘটিয়াছে, বড়ুও তেমনিই দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন। সেই ছন্দ, সেই সুর, পার্থক্য—দৃষ্টিভঙ্গির। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীরাধার একটি দিক্ দেখিয়াছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় নূতন দৃষ্টিলাভে সেই মহাভাবময়ীর আর একটি দিক্ দেখিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুইজন একই গোষ্ঠীর কবি'। (পৃঃ ১১৪—১৫)

এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য্য যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই একটি পদের সঙ্গে পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যের দুই একটি পদের ভাব ও ভাষাগত অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। যেমন বড়ু চণ্ডীদাসের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী' পদটির সঙ্গে

'প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥'

পদটির সাদৃশ্য এতই সুস্পষ্ট যে আমরা একটিকে অপরটির অনুকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এরূপ

ক্ষেত্রে আমরা স্বতই সিদ্ধান্ত করি যে পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাসের প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সমগ্র অংশ যদি একই কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা না যায়, তবে এরূপ অনুমানও অযৌক্তিক নয় যে, পরবর্ত্তী কালে রচিত পদের অনুরূপ কোন কোন পদ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 'ভাষাতত্ত্বের' দিক্ দিয়া সমগ্রভাবে গ্রন্থখানির বিচার আজও হয় নাই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের' প্রারম্ভে দেখিতে পাই—

'সভাপতি আর সব সভাসদ্ জন।
আলপমতীঞ তোহ্মাতে শরণ'॥

'সভাপতি' পদটি সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ হইলেও প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোথাও বোধ হয় ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। সুতরাং এখানে অন্ততঃ প্রথম ছত্রটির প্রাচীনত্বে সন্দেহ হয়। গ্রন্থের অন্যত্রও এইরূপ সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

আমাদের সিদ্ধান্ত এই, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ড ও বিরহ-খণ্ডের স্থানে স্থানে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা থাকিলেও এবং গ্রন্থের অংশবিশেষের সহিত পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যের ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইলেও 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনকে' বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলে না—ইহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইলেও বৈষ্ণব সাধনা ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ এবং রসাভাসদুষ্ট বলিয়া আজও ভক্ত ও রসিক-সমাজ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত।

বা. যো.—৭

বিদ্যাপতি বিলাস-কলা-কুতূহলী বিদগ্ধ কবি,—বিশ্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হইলেও তিনি প্রধানত রাধাকৃষ্ণের নিত্য-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী মহাজনরূপেই ভক্ত ও রসিক সমাজে গৌরবলাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'কীর্ত্তিলতা' ও 'কীর্ত্তিপতাকা' অবহট্ঠ ভাষায়, 'পুরুষ-পরীক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক পদাবলী মৈথিলী ভাষায় রচিত হইয়াছে। তিনি শৈব হউন আর পঞ্চোপাসক হউন, তাহা পণ্ডিতের আলোচ্য বিষয়; কিন্তু শব্দৈশ্বর্য্য ও অর্থগৌরবে ভূয়িষ্ঠ, শ্রবণবিলাস ও রুচির পদ রচনায় তিনি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা অনন্যদুর্লভ।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, সম্ভোগ-শৃঙ্গারের কবি, ক্ষণে-ক্ষণে চঞ্চল, তরঙ্গলীলায়িত প্রেমের উল্লাস-বর্ণনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এ সকল উক্তি একদেশদর্শী বলিয়া বিভ্রান্তিকর। বিদ্যাপতির শিল্প-চাতুর্য্য এবং শব্দচিত্র-অঙ্কন ও শব্দসঙ্গীত-সৃষ্টিতে নৈপুণ্য সত্যই বিস্ময়কর, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগে একমাত্র তিনিই তাঁহার উপমাস্থল; আবার অন্তরের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তুলিবার শক্তিতেও তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে একক। বিশেষ একটি দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখিলে তাঁহাকে রূপমুগ্ধতার কবিও বলা চলে; কিন্তু ইহাই বিদ্যাপতির সমগ্র পরিচয় নহে। যে বিদ্যাপতি বিলাস-চঞ্চলা রাধিকার স্ফুটনোন্মুখ রূপ-লাবণ্য ও ব্রীড়াজড়িত মধুরিমাময় চাঞ্চল্যের বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম মিলনের চিত্র অঙ্কনে যিনি অসাধারণ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, প্রেমের পরিণতির চিত্র-অঙ্কনে, বিরহ ও ভাব-সম্মেলনের পদে তিনিই আবার প্রাকৃত পাঠকের মনকে

অতীন্দ্রিয় লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির রাধা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি নির্ব্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—'বিদ্যাপতির রাধিকার প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশী। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলা ও চাঞ্চল্য। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। হৃদয়ের নবীন বাসনা সহসা পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়, কিন্তু এখনও পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। একটু ব্যাকুলতা, আশা-নৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে॥* নবীনার নবপ্রেম যেমন মুগ্ধ, যেমন মিশ্রিত বিচিত্র কৌতুক-কৌতূহল-পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই কম নাই। চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর'।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা ও কৃষ্ণকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পদাবলী-সাহিত্যের এরূপ ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নন, তথাপি বিদেশী পণ্ডিতের সুবুদ্ধির আমরা প্রশংসা না করিয়া পারি না। আমাদের দেশের কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য সমালোচক বিদ্যাপতির পদাবলীর স্থানে স্থানে ইন্দ্রিয়-লালসার নগ্ন প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন, অথচ বিদেশী পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন বলিতেছেন—

'I have grouped the songs into classes, according to the subject of which they treat;

one class, for instance, treating of the first yearnings of the soul after God, another of the full possession of the soul by love for God, another of the estrangement of the soul and so on. To understand the allegory, it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the messenger or *duti*, the Evangelist or the mediator and Krisna of course the deity. The glowing stanzas of Vidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the Song of Solomon is by the Christian priest'.

শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে 'কমলিনী'র যে উপমা দেওয়া হইয়া থাকে, উহার সার্থকতা আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীতে দেখিতে পাই। প্রথম যৌবনের বিকাশে নবানুরাগের উন্মেষবশত রাধিকার মধ্যে যে লীলা-চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, উহার অনবদ্য চিত্র বিদ্যাপতি অঙ্কিত করিয়াছেন। যৌবন-চেতনার প্রথম অনুভূতিতে রাধিকা বিলাসচঞ্চলা—

'খনে খনে নয়ন-কোণ অনুসরঈ।
খনে খনে বসন-ধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দশন ছুটাছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস'॥

এ বর্ণনা পাঠ করিয়া যাহারা সিদ্ধান্ত করেন, বিদ্যাপতির রাধিকা বিলাসকলাবতী ইন্দ্রিয়লালসাময়ী প্রাকৃত নায়িকা মাত্র, তাঁহারা পদকর্ত্তার প্রতি সুবিচার করেন না। বিদ্যাপতির

বিলাসিনী রাধিকা যখন তপস্বিনী রাধিকার মধ্যে নবজন্ম লাভ করেন, তখন আমরা পদকর্ত্তার মুখে শুনিতে পাই—

'অনুখন মাধব মাধব সুমরাইত
সুন্দরী ভেলি মাধাই'।

এখানে শ্রীমতী রাধিকার প্রেমের তপস্যা পরিপূর্ণ আত্ম-বিলুপ্তির মধ্যে অবসান লাভ করিয়াছে।

বিদ্যাপতি যেখানে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে অবশ্য তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের কবি, এমন কি, ভোগলালসার কবি বলিয়াও কোন কোন পাঠকের ধারণা হইতে পারে ; কিন্তু যেখানে তিনি মাথুর বা ভাব-সম্মেলনের পদ রচনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি প্রাকৃত পাঠকের মানসকেও মর্ত্ত্যের ধূলিমাটির উর্দ্ধে, এক অতীন্দ্রিয় লোকে উন্নীত করিয়াছেন। ভাব-সম্মেলনের পদে বিদ্যাপতির রাধা বলিতেছেন—

'পিয়া যব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে'॥

রাধিকা যদি নিজের সুকুমার তনুর দ্বারা প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য রচনা করিতে পারেন, যদি নিজের দেহের দ্বারা তাঁহার প্রীতি সঞ্চার করিতে পারেন তবেই তো তাঁহার জীবন ধন্য হয়। প্রাকৃত প্রেমে এ অনুভূতি কোথায় ?

আবার, কৃষ্ণবিরহে বেদনার্ত্তা রাধিকা অন্তরের মধ্যে এক সীমাহীন শূন্যতা অনুভব করিয়া বলিতেছেন—

'সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হোয়ব কান॥

কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহকি বাধা'॥

রাধার এই উক্তিতে কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনী সূচিত হইতেছে ?

কখনও বা রাধার অপরিসীম বেদনা দুই একটি বাক্যে অপরূপ প্রকাশ লাভ করিয়াছে—

'কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব হম দিন রজনী'॥

বিদ্যাপতি বিরহিণী রাধার যে ছবিটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের শূন্যতাও যেন আমাদের প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিয়াছে, অথচ বিরহের বর্ণনায়ও বিদ্যাপতি অলঙ্কার-প্রয়োগে কার্পণ্য করেন নাই। যথা,—

'সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নিহারি চাতকী মরি গেল'॥

অথবা—

'কত দিনে চাঁদে কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি'॥

বিদ্যাপতির বিরহ বা ভাবসম্মেলনের পদগুলি অনুভূতির গভীরতায় অতুলনীয়। যাহারা বিদ্যাপতির পদাবলীতে ইন্দ্রিয়-লালসার প্রকাশ দেখিতে পান, তাঁহারাও দীনেশচন্দ্রের উক্তির সঙ্গে একমত হইবেন—

'এই রাধা (বিদ্যাপতির রাধা) জয়দেবের রাধার ন্যায়—শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন। তাঁহার ফ্রেমে বাঁধা

বিলাসকলাময়ী নায়িকার চিত্রপটখানি সহসা সজীব রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নব লাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহান্ত মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য'।

আমরা দেখিয়াছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের যথার্থ ভাষ্য বলিয়া মনে করেন। মালাধর বসুই সর্ব্বপ্রথম ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুসরণে এবং শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কে লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলা প্রাধান্য লাভ করিলেও মাধুর্য্য-লীলা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই, বরঞ্চ রাসলীলার বর্ণনায় মালাধর অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে যে সব ভক্ত কবি মালাধরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচরিত' রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর' রচয়িতা রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কে কোন লৌকিক কাহিনীকে তাঁহার কাব্যে স্থান দেন নাই। রঘুনাথ ছিলেন ভক্ত ও রসগ্রাহী কবি। স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার কথকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

> 'প্রভু বোলে ভাগবত এমন পড়িতে।
> কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
> এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
> ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য'॥

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অনুবাদকের গৌরবই শুধু মালাধরের প্রাপ্য নয়, তিনি প্রাক্-চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগের ভাবধারার মধ্যে সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন। মালাধরের কবিত্ব-শক্তিও ছিল অসাধারণ। যাঁহারা বলেন, মালাধরের বিশেষ কবিত্ব-শক্তি ছিল না, তাঁহারা হয় মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই অথবা নিজেরা কাব্য-রসজ্ঞ নহেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায়, গোপিকাগণের বিরহার্ত্তির বর্ণনায় ও যুদ্ধাদির বর্ণনায় মালাধর সমান উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

'এই বংশীর কথা এমন সুন্দর ভাবে ভাগবতে কোথাও নাই,—ইহা মালাধর বসুর নিজস্ব রচনা। এই মোহন মুরলীর সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদের বাঁশীর সুরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে'। আমরা মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

'বৃন্দাবন-মাঝে যবে বংশীনাদ পূরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে॥
বৎসগণ সঙ্গে আসে বেণূ বাজাইয়া।
গোকুলের রমণীর চিত্ত সে হরিয়া॥
যমুনার কূলে যবে বংশীতে দেই সান।
ফিরিয়া যমুনা নদী বহই উজান॥
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল।
তা শুনি ময়ূর-পক্ষ নাচিতে লাগিল॥

শুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীর নাদে ফুল-ফল ধরে তরুগণে'॥

মালাধর বসু লোক-কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়াই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং সমাজের কল্যাণের দিকে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। ভগবানের রাসলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রাকৃত জনে হয়তো এই অপ্রাকৃত লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না এবং ভগবানের মাধুর্য্য-লীলা-সম্পর্কে তাহাদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়ায় সমাজে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে। তাই রাসলীলা-সম্পর্কে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, মালাধর বসু শুধু সেই অংশের অনুবাদ করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, তিনি তাঁহার গ্রন্থে পাঠক ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। ভাগবতের অনুসরণে তিনি রাসলীলার তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়া ভগবান বাসুদেব-সম্পর্কে বলিতেছেন—

'আত্মপর নাহি তার জগৎ-ভিতরে।
পাপ-পুণ্য যত তাঁর না লাগে শরীরে॥
ভাল-মন্দ পোড়ে অগ্নি দেখে জগজনে।
যেই দ্রব্য পোড়ে হয় অগ্নির সমানে॥
বিষ হেন বিষম বস্তু মহাদেব খায়ে।
আর জন হৈলে মৃত্যু ততক্ষণ পায়ে'॥

তারপর তিনি প্রাকৃত জনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

"সংসারিকা লোক না করিহ পরদার।
পরদার অধিক পাপ না জানিহ আর॥

চৌরাশি নরক-কুণ্ড যত যমলোকে।
পরদার করিলে তা ভুঞ্জয়ে একে একে ॥
না করিহ পরদার শুন সর্ব্বজনে।
পরনারী-পরশনে নরক-গমনে ॥"

সমাজের কল্যাণের দিকে মালাধরের দৃষ্টি কিরূপ তীক্ষ্ণ ছিল, উপরি-উদ্ধৃত পংক্তি কয়টি হইতেই তাহা বুঝা যায়।

আমরা সংক্ষেপে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। এবার চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

উপসংহারে মালাধর বসু সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের একটি দিকের পথিকৃৎ নহেন, তাঁহারই প্রেরণায় ষোড়শ শতাব্দীর অনেক বাঙ্গালী কবি শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় চরিত অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। আমরা এই সকল কবির মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য কবিদের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' বা 'ভাগবতসার' রচয়িতা মাধব আচার্য্য, 'গোপালবিজয়ের' রচয়িতা দেবকীনন্দন সিংহ বা কবিশেখর, 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' রচয়িতা কৃষ্ণদাস এবং 'গোবিন্দমঙ্গলের' রচয়িতা দুঃখী শ্যামদাস যথার্থ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, মালাধরের প্রেরণায়ই ষোড়শ শতকে অনুবাদ-সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

ষোড়শ শতকের পদাবলী-সাহিত্য

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির যে আত্মোপলব্ধি, যে মোহনির্ম্মুক্তি ঘটিয়াছিল, তাহার মনীষা ও অধ্যাত্ম চেতনার যে নব জাগরণ ঘটিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর লোকোত্তর চরিত্র ও দিব্য জীবন। এই শতকেই বাংলার কাব্যকুঞ্জ যুগপৎ বহু কবি-কোকিলের কলগানে মুখরিত হইয়াছিল। কিন্তু এই পদাবলী-সাহিত্যে এ যুগের গীতি-কবিতার মত কবিগণের আত্মগত অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার মূলে ছিল পরম্পরা-গত সাধনার ধারা এবং সর্ব্বোপরি 'জঙ্গম হেম-কল্পতরু-সদৃশ' শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবন। তাই এই সাহিত্যের রস সম্যক্ আস্বাদন করিতে হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও অপ্রাকৃত রসশাস্ত্রের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এই জন্যই আমরা ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাগবতধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় সর্ব্বপ্রথম যে চরিত-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, উহার মধ্যে যুগ-মানসের প্রতিফলন দেখিতে চেষ্টা পাইয়াছি এবং বিভিন্ন চরিত-গ্রন্থের মূল্য বিচার করিয়াছি। ষোড়শ শতকে যে পদাবলী-সাহিত্য ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল, (শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবিষয়ক, রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলা-সম্পর্কিত ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-সংক্রান্ত) আমরা এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পদাবলী-সাহিত্য ও চরিত-সাহিত্য ভিন্ন ষোড়শ শতকে সাহিত্যের আরও দুইটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল,—অনুবাদ-সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য। অনুবাদ-সাহিত্যের দুইটি প্রধান শাখা—শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও মহাভারতের অনুবাদ। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় চরিত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভাগবতের অনুবাদের লক্ষ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও ভক্তিধর্ম্মের প্রচারের দ্বারা লোককল্যাণ-সাধন কিন্তু ভারত-পাঁচালি-রচনার মূলে ছিল রাজপুরুষ বা ভূস্বামিগণের উৎসাহ। ষোড়শ শতকে মঙ্গলকাব্যের ধারাও প্রধানত দুইটি স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই যুগে কেহবা মনসা দেবীর, কেহ বা চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যবশত এই যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে এমন একজন শক্তিশালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি সর্ব্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যকে যথার্থ কাব্যের মর্য্যাদা দান করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

বস্তুত, ষোড়শ শতকের সাহিত্য নানা ধারায় প্রবাহিত হইলেও কাব্যরসিক জনগণ স্বীকার করিবেন যে, একদিকে মহাজনগণের রচিত অজস্র পদাবলী ও অপর দিকে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলই যথার্থ সাহিত্যিক মর্য্যাদার দাবী করিতে পারে। মহাজন-পদাবলী মধ্যযুগীয় সাহিত্যের রোমান্টিক ধারা এবং মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' ইহার ক্লাসিক ধারা। আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে প্রধান প্রধান পদকর্ত্তাদের রচনা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিব। পরবর্তী অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মুকুন্দরামের স্থান-নির্ণয়ে প্রয়াস পাইব।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে আমাদের দেশে মধুর ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের ধারা প্রচলিত ছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল যে বৃন্দাবনের গোপিকাগণের ভাবে ভাবিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান। সুতরাং জয়দেব বা বিদ্যাপতির রাধা যে ইন্দ্রিয়লালসাময়ী প্রাকৃত নায়িকা-মাত্র, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব হয়তো রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক-বর্জ্জিত বহু আদি-রসাত্মক শ্লোক রচনা করিয়াছেন, এবং বিদ্যাপতি সম্ভবত সামাজিক জীবনে শৈব বা পঞ্চোপাসক ছিলেন কিন্তু ইহা হইতে এমন কথা প্রমাণিত হয় না যে, বৈষ্ণবীয় সাধনা বা ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ছিল না অথবা তাঁহারা বৈষ্ণবীয় রসসাধনার মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই। বরঞ্চ এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে যে, তাঁহারা সীমাবদ্ধ মানুষী ভাষায় রাধাকৃষ্ণের লীলা-মাধুরীর বর্ণনা করায় এযুগের অনেক পণ্ডিত তাঁহাদের সম্পর্কে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাস্তবিক, বৈষ্ণব সাধকগণ মানুষের কাম প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করেন নাই, এই প্রবৃত্তি যে বিশ্বসৃষ্টির মূলে এবং মানুষ যে ললিতকলার অনুশীলনের মধ্য দিয়া এই প্রবৃত্তিকেই সূক্ষ্মভাবে চরিতার্থ করে, এ তত্ত্বও তাঁহারা সম্পূর্ণ-রূপে অবগত ছিলেন, তাই তাহারা মানুষকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের পরামর্শ দেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন,—তোমার কাম সেই

অখিলরসামৃত-সিন্ধু শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ কর, শুধু কাম কেন, তোমার সকল বৃত্তি তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তন্ময়তা লাভ কর। ইহাই বৈষ্ণব সাধনায় process of sublimation.

'কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে'॥

তথাপি এ কথা সত্য যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে মানব-জীবন ও জগৎসম্পর্কে বাঙ্গালীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রাক্-চৈতন্য যুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে এই পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গি। মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের আলোক-পাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা চৈতন্যোত্তর যুগের সাধকগণের দৃষ্টিতে এক নূতন তাৎপর্য্য লাভ করিয়াছিল। ইহারই ফলে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলারস-আস্বাদনের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই পদ্ধতি এখনও চলিতেছে, কীর্ত্তনীয়াগণ যে কোন রস-পর্য্যায় অবলম্বনে পালাগান গাহিবার পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকার দ্বারাই উহার সূত্রপাত করিয়া থাকেন।

আমরা প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-সাহিত্যের কয়েকটি পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতেছি।

(১) প্রাক্-চৈতন্য যুগের শ্রেষ্ঠ মহাজন বিদ্যাপতি প্রার্থনার কয়েকটি চমৎকার পদ রচনা করিয়াছেন, ঐ সমস্ত পদের আন্তরিকতা আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে, কিন্তু উহাতে ভবসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ লাভের যে আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে, চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-সাহিত্যে তাহা

কোথাও দেখা যায় না ; কারণ, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে—

'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥"

বিদ্যাপতি বা জয়দেবের নিকট কিন্তু মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান ছিল না। জয়দেব প্রার্থনা করিতেছেন—'কুরু কুশলং প্রণেতেষু'। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

'ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥'

অথবা অন্যত্র—

'ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিহু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক নাথ কহায়সি
অব তারণ-ভার তোমরা ॥'

জয়দেবও ভগবানকে 'ভব-খণ্ডন' ও 'ভব-মোচন' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন কিন্তু মহাপ্রভু আমাদিগকে শিখাইলেন, শ্রীভগবানের চরণে অহৈতুকী ভক্তিই একমাত্র প্রার্থনীয়, তাই গোবিন্দদাস কবিরাজ নন্দ-নন্দনের নিকট নববিধা ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন।

'শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন দাসীরে।
পূজন সখীজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে ॥'

কিন্তু নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনার পদগুলিই বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৃন্দাবন-ধামে সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবাকে তিনি জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, যথা—

'হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥'

অথবা—

'হরি হরি আর কবে এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নূপুর পরাইব॥'

(২) প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদকর্ত্তা এবং পদাবলী-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক জয়দেব রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা (বাসন্ত রাস) অবলম্বনে কাব্য রচনা করিলেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-লীলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জয়দেব শ্রীভগবানের দশাবতারের স্তব রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে 'দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন', 'কালীয়-বিষধর-খঞ্জন', 'মধু-মুর-নরক-বিনাশন', 'সমর-শমিত-দশকণ্ঠ' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-লীলা জ্ঞাপক পদে সম্বোধন করিয়াছেন। বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও বিভিন্ন অবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে (এ বিষয়ে জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাসের বর্ণনায় কিছু অনৈক্য আছে)। বড়ু চণ্ডীদাসের মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধানত কংসকে সংহার করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি অবশ্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলার উল্লেখ করেন নাই কিন্তু প্রাক্-

চৈতন্য যুগের অনুবাদ-সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-লালাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের শুধু মাধুর্য্য-লীলাই চৈতন্যোত্তর যুগের উপজীব্য, তাঁহারা ঐশ্বর্য্য-লীলার উল্লেখ করেন নাই বলিলেই চলে। অবশ্য চৈতন্যোত্তর যুগে 'কালীয়দমন' সম্পর্কে মাধবদাস কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত পদে শ্রীকৃষ্ণের মহিমার চেয়ে ব্রজবাসিগণের বেদনাই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, কালীয়-দমন-লীলা প্রবাসের এবং প্রবাস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অন্তর্গত। সুতরাং কালীয়দমনের পদে ব্রজবাসিগণের বিরহের মাধুর্য্যই প্রকটিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হয় নাই।

(৩) প্রাক্-চৈতন্য যুগে জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদে সম্ভোগ-শৃঙ্গার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের প্রাধান্য। 'মিলন ও বিরহ উভয়ের মধ্যে বিরহই আমাদের অধিকতর কাম্য, কেননা, মিলনে যাহাকে একান্ত ভাবে কাছে পাই, বিরহে তাহাকে নিখিল ভুবনে ব্যাপ্ত করিয়া দিই'—ইহাই আমাদের দেশের ভক্ত ও রসিকগণের মর্ম্মবাণী। প্রাকৃত প্রেমেও বিরহের গানই সহজে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। মেঘদূত চিরন্তন বিরহ-কাব্য বলিয়াই পৃথিবীর রসিক-সমাজে এমন মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা যদি বিরহের তপস্যার মধ্য দিয়া নবজন্ম-লাভ না করিতেন, তবে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া বিবেচিত হইত না। অপ্রাকৃত জগতে বিরহের মর্ম্ম-

স্পর্শিনী গীতি বাইবেলের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত Song of Songs আর শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের অন্তর্গত বিরহার্ত্তা গোপীগণের বিলাপ। ভক্ত কবীর বলিয়াছেন—'বিরহ ভিন্ন এ তনু শূন্য, বিরহই এ দেহের রাজাধিরাজ, যে ঘটে বিরহের সঞ্চার না হয়, সে ঘট তো মশানের মত।' প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেমেও যেখানে অমরা বিরহের আর্ত্তি শুনিতে পাই, সেখানে আমাদের মন যেন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় লোকে উধাও হইয়া ছুটিয়া যায়। পদাবলী-সাহিত্যে যেখানে রাধিকার আর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে প্রাকৃত পাঠকের মনও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া কোন্ এক উর্দ্ধলোকে বিচরণ করে। এইজন্যই এ যুগের অনেক পণ্ডিতের মতে প্রাক্-চৈতন্য যুগের রাধিকা প্রধানত প্রাকৃত নায়িকা কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের প্রভাবে পদাবলী-সাহিত্য প্রাক্তন ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হইলেও অধ্যাত্মলোকে পর্য্যবসান লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব সাধনা ও ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিছক সাহিত্য-হিসাবে মহাজন-পদাবলীর আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক।

(৪) প্রাক্-চৈতন্য যুগের মহাজনগণ যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন একদিকে ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অপর দিকে একটা সমষ্টিগত ঐতিহ্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যেই তাহাদের চিত্ত তন্ময়তা লাভ করিয়াছে, তাই তাঁহারা ক্ষুদ্র, পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা বিস্মৃত হইয়া লীলারস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছেন।

কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যেই রাধা ও কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-তনু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্য জীবনের আলোকচ্ছটায় তাঁহারা রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে—

'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥'

আর—

'মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥'

শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা ও ঐতিহ্য লোকাত্তর-চমৎকার রসরূপ লাভ করিয়াছে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস ও রায়শেখরের পদাবলীতে। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস যথাক্রমে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির ভাব-শিষ্য ও উত্তরসাধক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এরূপ উক্তি আংশিক সত্য হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে বিভ্রান্তিকর।

জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাব-শিষ্য বলা হইলেই এ কথা মানিয়া লওয়া হয় যে, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু কয়েকটি জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী ভিন্ন আমরা চণ্ডীদাসের জীবন-সম্পর্কে কিছুই জানি না। তিনি যদি চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজন হন, তবে তাঁহার রচিত একটিও গৌরচন্দ্রিকার পদ বা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের সন্ধান মিলে না কেন? আর তিনি যদি প্রাক্-চৈতন্য যুগের মহাজন হন, তবে কি তিনি ধ্যান-দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়া 'আজু কে গো মুরলী বাজায়' ইত্যাদি

পদ রচনা করিয়াছেন ? আবার পূর্ব্বরাগের বর্ণনা করিতে গিয়া সত্যই কি কোন প্রাক্-চৈতন্য যুগের মহাজন মহাপ্রভুর প্রথম প্রেমাবেশের পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন—

'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী-পারা॥'

অথবা শ্রীমতী রাধার মনে প্রথম অনুরাগ-সঞ্চারের ফলে ভাবদৃষ্টির পরিবর্ত্তনের কথাই চণ্ডীদাস অতুলনীয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, মহাপ্রভুর জীবনেও ভগবৎ-প্রেমের উদয়ে সেইরূপ অবস্থা-প্রাপ্তি একটা স্বাভাবিক ঘটনা, চণ্ডীদাস এখানে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত করেন নাই। গয়াধামে মহাপ্রভু ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনেও এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

'মাধবেন্দ্র পুরী-কথা অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশন মাত্র হয় অচেতন॥'

কিন্তু চণ্ডীদাস যদি সত্যই প্রাক্-চৈতন্য যুগের মহাজন হন, তবে কি তাঁহার রচিত পদাবলীর ভাষা লিপিকারের হস্তে বা গায়েনের মুখে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে ? আমরা এ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না,

চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমত-সম্পর্কে বা চণ্ডীদাস-ভণিতা-যুক্ত পদে সহজিয়া প্রভাব-সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করিব না, আমরা শুধু চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভা ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিব।

বৈষ্ণব কবিগণ সাধারণত অলংকরণ-প্রিয়, মণ্ডনকলার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। গীতগোবিন্দের রচয়িতা স্বয়ং 'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী জয়দেব-সরস্বতীর' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসও নিজের পদাবলী-সম্পর্কে বলিয়াছেন—

'রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥'

জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, শ্রীরূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দ, কবি কর্ণপূর প্রভৃতি প্রত্যেকেই অসাধারণ বাগ্-বৈদগ্ধ্য ও শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর বৈষ্ণব কবি আছেন যাঁহাদের সম্পর্কে 'হৃদে ভাব ওঠে মুখে ভাষা ফোটে' এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, যাঁহারা রচনায় বৈদগ্ধ্য-বিলাস বা মণ্ডল-শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দেন নাই, কিন্তু অনাড়ম্বর, অনলঙ্কৃত ভাষায় অন্তরের গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সে অনুভূতি পাঠকের চিত্তে সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই শ্রেণীর মহাজনদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তথাপি, এ কথা সত্য যে, চণ্ডীদাসের ভাষা যেরূপ নিরাভরণ, জ্ঞানদাসের ভাষা সর্ব্বত্র সেরূপ নহে। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস উভয়েই কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী, পূর্ব্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদ-রচনায়

ইঁহারা উভয়েই অন্যান্য মহাজনদের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। তথাপি, কোন কোন পদে জ্ঞানদাস মণ্ডন-শিল্পের দিকে একটু লক্ষ্য দিয়াছেন। জ্ঞানদাসের ভণিতায় এমন একটি পদ পাওয়া যায় যাহার ভাষা অত্যন্ত কৃত্রিম, ঐ পদের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীমতী সখীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন—

'কুন্তীর নন্দন মূলে কশ্যপনন্দন দোলে
মন্মথের মন মথে তায়।
খগেন্দ্র নিকটে বসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরছায়॥

[কুন্তীর নন্দন মূলে অর্থাৎ কর্ণমূলে। কশ্যপনন্দন দোলে অর্থাৎ সূর্য্য বা সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল মণিকুণ্ডল দোলে। খগেন্দ্র-নিকটে অর্থাৎ গরুড়সদৃশ নাসিকার নিকটে। রসেন্দ্র অর্থাৎ অধর।]

চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিলে আমরা এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারি যে, তিনি বিদগ্ধ না হইলেও যথার্থ প্রেমিক ও রসিক ছিলেন। একজন প্রতীচ্য দার্শনিক বলিয়াছেন, মানুষ যখন Intuition বা কবিসুলভ দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হয়, তখন প্রকাশ-ভঙ্গি বা Expression এর জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হয় না, ভাবই আত্মপ্রকাশক্ষম ভাষার সৃষ্টি করিয়া লয়। চণ্ডীদাসের পদাবলী-সম্পর্কে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের দেশের অনেক নিরক্ষর সাধকের গানেও দেখিতে পাই,—অনুভূতির গভীরতা হইতেই এক অভিনব প্রাণের ভাষার জন্ম হইয়াছে। লৌকিক প্রেমের রাজ্যেও আমরা ময়মনসিংহ-গীতিকার স্থানে স্থানে এই

অনলংকৃত মর্ম্মস্পর্শী ভাষার সাক্ষাৎ পাই। অনুভূতির এই নিবিড়তার গুণেই চণ্ডীদাস চিরদিনের জন্য আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদ-সম্পর্কে আমরা মিল্‌টনের ভাষায় বলিতে পারি 'where more is meant than meets the ear.' চণ্ডীদাসের একটি বহুল-উদ্ধৃত পূর্ব্ব-রাগের পদে যে গভীর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা রহিয়াছে, তাহার তুলনা কোথাও মিলে না এবং সম্ভবত এই জন্যই রসিক-চূড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী এই পদটি অবলম্বনে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন। পদটির মধ্যে বৈষ্ণবীয় সাধনার সঙ্কেতও নিহিত আছে।

'সেই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেথায় বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী-কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥'

এই পদটিতে সাধনার তিনটি অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে—নাম-শ্রবণ, নাম-মাধুর্য্য-আস্বাদন ও নাম-জপ। সাধকের রতি যখন গাঢ় প্রেমে পরিণতি লাভ করে, তখন লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি লৌকিক ধর্ম্ম তুচ্ছ হইয়া যায়। অবশ্য যতদিন প্রেম প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন চিত্ত একদিকে সংসারের আকর্ষণে ও অপর দিকে ভগবদাকর্ষণে দোলায়মান হইতে থাকে কিন্তু নামে রতির সঞ্চার হইলে মানুষ কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে পারে না—ইহাই পদটির অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা। আবার, একটি পদে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, সেই বর-নাগর রাধিকার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার জীবনে রূপান্তর ঘটিতেছে। চণ্ডীদাস এখানে একটি উপমার প্রয়োগ করিয়াছেন—

'এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ।'

বৈষ্ণব অলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন, অনুরাগের লক্ষণ এই যে, ইহা 'তিলে তিলে নূতন হোয়'। এইজন্যই প্রেমের আস্বাদনে এত মাধুর্য্য, এত বৈচিত্র্য।

'সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে'॥

এই অনুরাগ ত্রিবিধ,—রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও অভিসারানুরাগ। অবশ্য প্রাকৃত জগতেও অনুরাগের এই ত্রিবিধ প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

'অনুরাগো ভবেৎ ত্রিধা রূপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ।
অভিসারানুরাগশ্চ জ্ঞায়ন্তে রসিকৈর্জনৈঃ ॥

অভিসারানুরাগের পদ-রচনায় গোবিন্দদাসে সমস্ত মহাজনকে অতিক্রম করিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগ ও রূপানুরাগ সম্পর্কে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, উহাতে পাই গভীর অনুভূতির সহজ প্রকাশ। কোন কোন পদ জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস উভয় ভণিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, ভাব-তন্ময়তায় ও অনলংকৃত অথচ মর্ম্মস্পর্শী ভাষার প্রয়োগ-কৌশলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অথচ, একথাও সত্য যে, জ্ঞানদাসের উপর প্রাক্তন মহাজনের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার ভাবদৃষ্টি ও প্রকাশ-ভঙ্গি অনেক স্থলে স্বতন্ত্র।

আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতে এমন দুই একটি ছত্রের সাক্ষাৎ পাই, যেখানে শব্দের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া অর্থ যেন এক অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয় লোকে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাধার অনুরাগের কথা বলিতে গিয়া চণ্ডীদাস যখন বলেন—

'অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়'॥

অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যখন তিনি বলেন—

'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া'॥

তখন আমরা বুঝিতে পারি, যথার্থ প্রেমের তপস্যা কি বস্তু —আমরা উপলব্ধি করি, যোগীরা দুশ্চর সাধনার বলে যে সমাধি লাভ করেন, প্রেমিক তাঁহার প্রিয়তমের ধ্যানের মধ্য দিয়াই

তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাহার মধ্যে অনন্তের আভাস পাই। এক হিসাবে মানুষমাত্রেই অনন্তের সাকার বিগ্রহ, কিন্তু যেখানে সাক্ষাৎ 'মন্মথমন্মথ' আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে, সেখানে আমাদের প্রেম হয় সীমাহীন, সেই অসীম প্রেমেই আমরা তাঁহাকে বশীভূত করি, অথচ তাঁহার সীমা খুঁজিয়া পাই না। তাই শব্দকুশলী কবি বিদ্যাপতিও এই প্রেমের রহস্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বলিয়াছেন—

> 'তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
> বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়'॥

কিন্তু আমরা বলিতেছিলাম চণ্ডীদাসের কথা। চণ্ডীদাসের প্রকাশ-ভঙ্গি তাঁহার অন্তরের অনুভূতিরই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাণীরূপ, ভাষার কারুকার্য্যের দিকে লক্ষ্য দিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ পদে গোবিন্দদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সঞ্চরণশীল অভিনব হেম-কল্পতরুর সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাঁহার অবিরলবর্ষী অশ্রুধারায় সে তরু সংবর্দ্ধিত হয় এবং উহাতে অশ্রু, পুলক প্রভৃতি ভাব-কদম্ব বিকশিত হয়, সে তরু হইতে স্বেদ-বিন্দু-রূপ মকরন্দ ক্ষরিত হয়, পরিমলে লুব্ধ ভকত-ভৃঙ্গকুল তাঁহার চরণ-তলে ঝঙ্কার করিতে থাকে আর সেই কল্পতরু প্রেমফল-বিতরণে অখিলের মনোরথ পূর্ণ করেন। গোবিন্দ ভাবাবিষ্ট লোচনে এই দিব্য মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন,

আর এই প্রেমের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন।

'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর-কিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু-দূর'॥

গোবিন্দদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, কিন্তু ভাবাবিষ্ট দৃষ্টিতে তিনি যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা নাই। 'কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর'। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ-রচনায় গোবিন্দদাস পূর্ব্বগামী সকল পদকর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষদর্শী কবিগণও এ বিষয়ে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ নহেন।

যে সকল প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে তাঁহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। নরহরি সরকার ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত, বংশীবদন, শিবানন্দ সেন, কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও রামানন্দ বসু, এই নয় জন পদকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নরহরি সরকার ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত ও বাসু ঘোষ গৌর-নাগরী ভাবের কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন। বাসু ঘোষের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-বিষয়ক পদ অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। আবার, নরহরি ও বাসু ঘোষ উভয়েই শ্রীগৌরাঙ্গের অন্ত্য লীলা বা দিব্যোন্মাদ-লীলার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্ত্তাদের অঙ্কিত আলেখ্য সহজেই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। ইঁহাদের সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা-সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ, ভক্তিভাবে আবিষ্ট হইয়াই ইঁহারা পদ-রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনা প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট, ভাষা অনাড়ম্বর, ইঁহারা গোবিন্দদাসের মত বৈদগ্ধ্য বা কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন-নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাসু ঘোষের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

'কাঁচা-কাঞ্চন-মণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ।
ও নব-কুসুম-দাম গলে দোলে অনুপাম
হিলন নরহরি-অঙ্গ'॥

প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্ত্তাদের বহু পদ পরলোকগত জগদ্বন্ধু ভদ্র-সঙ্কলিত গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোবিন্দদাসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, তাঁহার পদাবলীতে জ্ঞানদাস বা চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় অনুভূতির তীব্রতা বা নিবিড়তা নাই, আছে বর্ণাঢ্যতা, আছে অলংকরণের ঐশ্বর্য্য। তিনি প্রধানত একজন বিদগ্ধ মণ্ডনশিল্পী, রসসাগর তিনি দূর হইতেই দর্শন করিয়াছেন, ইহাতে সন্তরণ বা অবগাহন করিতে পারেন নাই। আর গোবিন্দদাসও স্বয়ং এবিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

'রসিকরোচন শ্রবণ-বিলাস
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস'॥

গোবিন্দদাস-সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নহে। একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, গোবিন্দদাস জয়দেবের মতই বিলাসকলা-কুতূহলী কবি, তথাপি তাঁহার পদাবলীতে এমন দুই একটি ছত্র রহিয়াছে যাহাতে কবি-চিত্তের অনুভূতির সান্দ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। আবার তাঁহার রচিত কোন কোন পদে গভীর ব্যঞ্জনা আছে, সেখানে বাচ্য অর্থ গৌণ ও ব্যঙ্গ্য অর্থই মুখ্য হইয়াছে। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের একটি পদে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীমতীর বিস্ময় ও সংশয় চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সমগ্র পদটির মধ্য দিয়া তাঁহার প্রেম-বিহ্বলতার চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'নীল রতন কিয়ে নবঘন-ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা।
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন-মহেন্দ্র-ধনু কিবা দিল দেখা'॥

শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—একি দেখিলাম! একি নীলকান্ত-মণি? না, নবীন মেঘের সমারোহ? সে অঙ্গের ছটা যে দেখিয়াও দেখিতে পারিলাম না। তাঁহার চূড়ার উপরে ময়ূরের পাখা বিরাজিত, বুঝিতে পারিলাম না, একি মদনের ধনু না ইন্দ্রধনু!

পূর্ব্বরাগের আর একটি পদে শ্রীরাধিকা সখীকে বলিতেছেন—

'হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ অগোর'।

তাঁহার যে অঙ্গেই আমার নয়ন পতিত হউক না কেন, তাহাতেই অনঙ্গ আমায় জর্জ্জরিত করিয়া তোলে, আর সেই রূপ-দর্শনের ফলেই আমার—

'মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা'

আমার মন্দির (গৃহ) অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, চন্দন দহন অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় তাপদায়ক হইয়াছে।

গোবিন্দদাস শুধু বিদগ্ধ শিল্পী নহেন, তিনি শুধু চৈতন্যোত্তর যুগের ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নহেন, তিনি প্রতিভারূপ দৈবী সম্পদের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই পদাবলীর সুরে ও ছন্দে এমন বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। অবশ্য একথাও সত্য যে ব্রজবুলি ভাষায়ই তাঁহার নির্ম্মিতি-কৌশল সমাধিক প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে যে, যে সমস্ত বাংলা পদের ভণিতায় গোবিন্দ-দাসের নাম পাওয়া যায়, সেগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত নহে, গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তীই সেগুলির রচয়িতা।

অভিসারের পদ-রচনায় গোবিন্দদাস পদাবলী-সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে দেখিতে পাই, প্রাকৃত নায়িকাও রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া দয়িতের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন। আমরা যখন কান্তের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য এমন ব্যাকুল হই যে, পথের সকল বাধাকে উপেক্ষা করিতে পারি, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের প্রেম গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অমরসিংহ অভিসারিকার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং সাভিসারিকা'।

যিনি কান্তের সহিত মিলিত হইবার জন্য সংকেত-স্থানে গমন করেন, তাঁহাকে অভিসারিকা বলা হইয়া থাকে। প্রেমের মধ্যে যে অমোঘ বীর্য্য আছে, অভিসারে তাহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা রাধা ও কৃষ্ণকে ভক্ত ও ভগবানের রূপক-হিসাবে গ্রহণ করেন—তাঁহাদের নিকটও অভিসারের পদাবলীর বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। তাঁহারা বলেন, শ্রীভগবানের বংশীধ্বনি যখন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে তখন আমরা লজ্জা-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, আর তিনিও আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,— অভিসার অষ্টপ্রকার, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে বলা হইয়াছে—

'সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট প্রকার।
জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা অভিসার॥
কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চরা।
গীত পদ্য রসসাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা'॥

জ্যোৎস্নাভিসার, তামসাভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, উন্মত্তাভিসার ও সঞ্চরাভিসার, —পদাবলী-সাহিত্যে এই অষ্ট প্রকার অভিসারেরই বর্ণনা পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস অভিসারের পদে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন, এবং অভিসারের পটভূমিকা-স্বরূপ বিভিন্ন ঋতুর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্যে গোবিন্দদাসের তুলনা বেশী মিলেনা, তাঁহার রচিত অভিসারের পদ অনেক স্থলেই চিত্রধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। আবার তাঁহার পদাবলীর অংশবিশেষ সঙ্গীত-ধর্ম্মী, উহাতে পাই গভীর ব্যঞ্জনা। গোবিন্দদাস অসাধারণ শক্তিশালী কবি হইয়াও কোন কোন স্থলে পূর্ব্বগামী কবিদের ভাব অনুসরণ করিয়াছেন। কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ের একটি শ্লোকের ভাবাবলম্বনে তিনি একটি পদ (কণ্টক গাড়ি ইত্যাদি) রচনা করিয়াছেন, আবার তাঁহার এই পদটির ছায়াবলম্বনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী পদ রচনা করিয়াছেন। কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ের শ্লোকটি এই—

> 'মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারকং
> গন্তব্যা দয়িতস্য মেঽদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
> আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
> কৃচ্ছ্রাল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যসতি'॥

গোবিন্দদাস যেখানে প্রাক্তন কবিগণের ভাবাবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন, সেখানেও তিনি সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এইজন্য উহা অক্ষমের ব্যর্থ অনুকৃতিতে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার 'অভিসার-শিক্ষার' পদটিতে একদিকে মৌলিক

কল্পনা ও অপর দিকে শব্দ-চয়ন-কৌশলের পরিচয় রহিয়াছে। শ্রীমতী বর্ষার বারিধারায় পিচ্ছিল, কণ্টকাকীর্ণ, সর্পসঙ্কুল পথে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে দয়িতের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাত্রা করিবেন, রজনীর ঘনান্ধকারে তাঁহাকে পথ চলিতে হইবে,—এই কঠোর সাধনায়, এই দুশ্চর তপস্যায় তো একদিনে সিদ্ধিলাভ করা যায়না। তাই তিনি গুরুজনের বচন উপেক্ষা করিয়া নিজ-গৃহেই সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদটিতে এই অভিসার-শিক্ষার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কাব্য-গুণে মূল শ্লোকটিকে অতিক্রম করিয়াছে।

'কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির-সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস-পরমাণ'॥
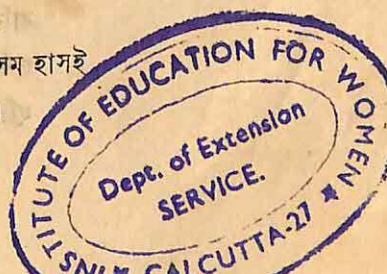
চিত্রাঙ্কনে গোবিন্দদাস সিদ্ধহস্ত, অভিসারের পটভূমিকা-রূপে তিনি বর্ষা, শীত প্রভৃতি নানা ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন। লীলা-বর্ণনের উদ্দেশ্য ভিন্ন গোবিন্দদাস অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব কবি ঋতু-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন নাই। গোবিন্দদাসের একটি বর্ষাভিসারের পদে ঘন বর্ষার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বহু দূর ব্যাপিয়া বর্ষা দোল খাইতেছে (রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' কবিতাটি তুলনীয়), ঝন ঝন শব্দে বজ্রপাত হইতেছে, দশদিক ব্যাপিয়া বিদ্যুতের জ্বালা প্রসারিত হইতেছে,—এই দৃশ্য কবি আমাদের প্রত্যক্ষগম্য বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্যে ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে পদটি আমাদের নিকট উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পথে শ্রীমতীর যে সমস্ত বাধা আছে, কবি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। কবি যখন বলেন 'হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার', তখন আমরা বুঝিতে পারি, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে,—তাঁহাদের মধ্যে আছে মানস-গঙ্গা-রূপ জলাশয়, উহা অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। গোবিন্দদাসের পদটি এই—

'মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর-দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার॥

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার'॥

গোবিন্দদাসের রচিত আর একটি অভিসারের পদে শ্রীমতী সখী-বচনের প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন--তোমরা তুচ্ছ দেহের কথা বলিতেছ, কিন্তু আমি যে আমার জীবনই তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছি,—

'যছু পদতলে নিজ জীবন সোপলু
তাহে তনু অনুরোধ'।

গোবিন্দদাসের আর একটি অভিসারের পদে পাই, আকাশে নব মেঘের সমারোহ, বাহিরে ঘনান্ধকারে নিজের দেহ পর্য্যন্ত লক্ষ্য হয় না, কিন্তু রাধিকার অন্তর-আকাশে শ্যাম-চন্দ্রের উদয় হইয়াছে এবং চন্দ্রোদয়ে তাঁহার মনোভব-সিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির এই বৈপরীত্য গোবিন্দদাসের নিপুণ তূলিকায় চমৎকার-রূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

'অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোরথ-সিন্ধু'॥

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ রাধার 'মানের' বর্ণনা করিয়াছেন, খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা রাধিকার চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রে মানের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ এবং মান-ভঞ্জনের বিবিধ উপায় বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেবের মান-ভঞ্জনের পদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণির অনুসরণে উজ্জ্বল-চন্দ্রিকায় বলা হইয়াছে, স্নেহের উৎকর্ষে নব-নব মাধুর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে কিন্তু সেই স্নেহে অদাক্ষিণ্য ঘটিলেই মানের উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশিযাপন করিয়া সম্ভোগ-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হন, তখন রাধার প্রেম বামতা প্রাপ্ত হয়, তিনি নায়কের প্রতি দারুণ রুষ্টা হন, এই অবস্থায়ই তাঁহাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলা হয়। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ যে ভাষায় মান-ভঞ্জনের পদ বর্ণনা করিয়াছেন, সে ভাষা হয়তো এ যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনঃপূত হইবে না, এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই জাতীয় পদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজনগণও মানভঞ্জনের পদ রচনা করিয়াছেন এবং ইঁহারা যে রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে অপ্রাকৃত লীলা-হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন পণ্ডিতই সংশয় প্রকাশ করেন নাই। এই জাতীয় পদের মধ্যে একটি অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিহিত আছে। ভগবান বাস্তবিকই বহুবল্লভ, কেননা, তিনি বহু ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু শ্রীরাধার মত যাঁহাদের কায়, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত শ্রীভগবানে সমর্পিত, আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা যাঁহাদের বিলুপ্ত, শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুর্জ্জয় অভিমান ভগ্ন করিতে চেষ্টা

করেন। পৃথিবীতে রাধার প্রেমের তুলনা নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্যান্য গোপিকাগণের সহিত তাঁহাকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তখনই রাধার প্রেম প্রতিকূলতা প্রাপ্ত হয়। রায় রামানন্দ রাসলীলার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—

'সাধারণ প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেমে হইল বামতা'॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্লভ, তাই স্বয়ং মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের একটি পদে তাঁহাকে 'লম্পট' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের একটি 'কলহান্তরিতার' পদে শ্রীকৃষ্ণের এই বহুবল্লভত্বের ভাবটি চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে ঃ—

'আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥
সজনি, তোহে কহুঁ মরমক দাহ।
কানুক-দোখে যো ধনী রোখয়ে
সোই তাপিনী জগমাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরয লাজ মান সঞে ভাঙ্গল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস কহই, সতি ভামিনি
কানুক ঐছন নেহ'॥

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-প্রচারের উদ্দেশ্যেই গোবিন্দদাস আপনার অলোকসামান্য প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির প্রতিভা যেন সর্ব্বত্র-গামিনী,—বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু গোবিন্দদাস একটি যুগের প্রতিনিধি, তাঁহার কাব্য-সাধনাও ধর্ম্ম-সাধনারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গোবিন্দদাস শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া পদ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আর বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি ছিলেন বলিয়াই চৈতন্যোত্তর যুগের কোন আলঙ্কারিকের নির্দ্দেশ অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। গোবিন্দদাস যে সময়ে পদ-রচনা করিয়াছেন, সে সময়ে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের পদাবলী পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে হইলে এই তত্ত্ব-বস্তুকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তদুপরি, গোবিন্দদাস অনেক স্থলেই সমাসবদ্ধ পদের বহুল প্রয়োগ করিয়া রচনায় ছন্দস্পন্দ আনয়ন করিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই বাক্য-কোবিদ, ইঁহারা কেহই হয়তো জনসাধারণের কবি নহেন, কিন্তু গোবিন্দদাস একটা যুগের ধারক ও বাহক বলিয়া অনেকের নিকট অধিকতর দুর্ব্বোধ্য, তথাপি কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদ আংশিকভাবেও আস্বাদন করেন নাই, এরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা বিরল। গোবিন্দদাসের পদাবলীর রস সহজে আস্বাদনীয় না হইলেও তাহার ছন্দ-হিল্লোল আমাদের কর্ণে

মধু বর্ষণ করে। আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, 'অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধু-ধারাম্'। মানুষের মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব যে অপরিসীম, বহিঃ-প্রকৃতির দৃশ্য, শব্দ ও গান যে মানুষের মনকে বিচিত্র ভাবে দোলা দেয়, প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে প্রকৃতি যে কখনও প্রতিকূলতা, কখনও সহায়তা করে, গোবিন্দদাস সে সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলীই ইহার প্রমাণ।

যোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা বলরাম দাসের কবিত্ব যেন নির্ঝরিণীর ধারার মত স্বত-উৎসারিত, তথাপি একথা সত্য যে, তিনি প্রয়োজন মত অলঙ্কার-প্রয়োগেও কার্পণ্য করেন নাই। অনুভূতির গভীরতায় ও প্রকাশ-ভঙ্গির প্রাঞ্জলতায় তিনি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সমগোত্রীয়। বলরাম দাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— এ সংসারে কোথাও তোমার তুলনা খুঁজিয়া পাই না, কোটি-কল্প নিমেষশূন্য নয়নে তোমায় নিরীক্ষণ করিলেও আমার লোচনের তৃপ্তি হয় না। বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাধার নিকট 'কিমপি দ্রব্যম্', রাধাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাই। তাই, কেহই কাহারও অন্ত খুঁজিয়া পান না।

'তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি ॥
বসিয়া দিবস-রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কল্প যদি নিরবধি দেখি ॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন-সমান' ॥

বলরাম দাসের ভাষা অনেক স্থলেই নিরাভরণ কিন্তু যেখানে তিনি প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন সেখানে ভাষা-জননীর অঙ্গ নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত গৌরচন্দ্রিকার পদটিতে যেমন অনুপ্রাস-প্রয়োগের নৈপুণ্য আছে, তেমনই শ্রুতিসুখকর ধ্বনি-তরঙ্গ আছে।

'কুসুমে খচিত রতনে রচিত
চিকণ চিকুর-বন্ধ।
মধুতে মুগধ সৌরভে লুবধ
ক্ষুবধ মধুপ-বৃন্দ॥
ললাট-ফলক পীবর তিলক
ফুটিল অলকা-সাজে!
তাণ্ডবে পণ্ডিত পুলকে মণ্ডিত
গণ্ড—মণ্ডল রাজে'॥

কিন্তু বলরাম দাস যে গুণে আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা হৃদয়ের গভীরতম ও সূক্ষ্মতম অনুভূতির স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত প্রকাশ। তিনি রসগ্রাহী ও তত্ত্বদর্শী, আবার তাঁহার রচিত বাৎসল্য-রসের পদগুলি বাস্তব রস-সমৃদ্ধ। তাঁহার রচিত পদে এমন দুই একটি ছত্রের সাক্ষাৎ মিলে যাহার মধ্যে গভীর অধ্যাত্ম তাৎপর্য্য নিহিত অথচ তত্ত্ব যেখানে অপূর্ব্ব কাব্যময় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বলরাম দাসের এইরূপ একটি ছত্র 'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির' রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। মিলন-সুখের মধ্যেও যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা জাগিয়া থাকে, বলরাম দাসের একটি মধুর রসের পদে এই ভাবটি চমৎকাররূপে প্রকাশিত হইয়াছে—

'মোর কাছে কাছে থাকে, সদা চোখে চোখে রাখে,
তবু মোরে পলকে হারায়।
এ বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে যেন বা রাখিতে চায়।
হার নহে পিয়া, গলায় পরিএ, চন্দন নহে মাখে গায়।
অনেক যতনে, রতন পাইয়া, সোয়াস্তি নাহিক পায়॥
সাজায়ে আমায়, বসন পরায়, আবেগে লইয়া কোরে।
দীপ লইয়া হাতে, মুখ নিরখিতে, তিতল নয়ন-লোরে॥
চরণ ধরিয়া যাবক রচই, আলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম-চিতে, ভাবিতে ভাবিতে পাঁজর হইল শেষ।'

পদাবলী-সাহিত্যে বাৎসল্য রসের পদ অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু বলরাম দাস বাৎসল্য-রসের বর্ণনায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি যে শিশুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সে শিশু চিরন্তন মানব-শিশু ;—ভগবান যখন যোগমায়ার দ্বারা আপন স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া মানব-শিশু-রূপে লীলা করেন, তখন তাহাকে যে প্রাকৃত শিশুর মতই আচরণ করিতে হয়, এ কথা বলরাম দাস কখনও বিস্মৃত হন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বৈষ্ণব কবিও বাৎসল্য রসের একটি চমৎকার পদ রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচিত সেই পদটি এক কালে লোকের মুখে মুখে গীত হইত—

'শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে,
যেন সে অঞ্চলচাঁদে অঞ্চল ধরে কাঁদে
জননী দে ননী দে ননী বলে'।
ইত্যাদি

শাক্ত পদাবলীতেও আগমনী ও বিজয়ার গানে বাৎসল্য রস ক্ষরিত হইতেছে। ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ এই আগমনী ও বিজয়ার গানের প্রবর্ত্তক। এই সকল গানের মধ্য দিয়া কন্যাবিচ্ছেদের বেদনা অপূর্ব্ব প্রকাশ লাভ করিয়াছে, আগমনীর গানে যেমন আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা আছে, বিজয়ার গানে তেমনই পুনর্মিলনের আশ্বাস আছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রস হইতে শাক্ত পদাবলীর বাৎসল্য রসের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ভগবানকে মধুরভাবে ভজনের পদ্ধতি সুফী সাধক ও খ্রীষ্টীয় অলোকপন্থী (মিষ্টিক) উপাসকদের মধ্যেও প্রচলিত আছে, কিন্তু বাৎসল্য রস আশ্রয় করিয়াও যে ভগবানের ভজনা করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত একমাত্র বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকগণই প্রদর্শন করিয়াছেন। এ দেশের জননীরা পর্য্যন্ত গোপাল জ্ঞানে আপন সন্তানকে লালন পালন করিয়াছেন। বলরাম দাসের রচিত নিম্নোক্ত পদটির ছত্রে ছত্রে যেন নন্দরাণীর স্নেহ-বিগলিত অন্তরের বাৎসল্য রস ক্ষরিত হইতেছে—

'শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল রাখিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙা পায় জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন॥

নিকটে গোধন রেখ মা বলে শিঙায় ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলে গোপ জাতি গোধন-পালন বৃত্তি
তেঁই বনে পাঠাই যাদব॥
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া দিব মোরা জোগাইয়া
তোমার আগে করিনু নিশ্চয়'॥

আর একটি প্রসিদ্ধ পদে বলরাম দাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি সখাগণের সঙ্গে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণ-বলরাম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এই চিত্রটি বলরাম দাসের তূলিকায় নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

'চাঁদ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু-রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইয়া গোকুলের মুখে॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম॥

ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু   গগনে গোক্ষুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ   আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥'

বলরাম দাসের পূর্ব্বগামী কবি বাসুদেব ঘোষও বাৎসল্য রসের চিত্র-অঙ্কনে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের শৈশব-লীলার চিত্রই অঙ্কিত হয় নাই, দুই একটি কথায় শচীমাতার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়খানিও আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—

'শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মন লোভা' ॥

বলরাম দাসের এ শিশু চিরন্তন, সর্ব্বকালীন; এই শিশুর ভাষণ, নর্ত্তন প্রভৃতি চিরদিনই জগ-জন-মনো-মোহন।

শুধু বাৎসল্য রস নয়, রূপানুরাগ ও রসোদ্গারের পদেও বলরাম দাস উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। বলরাম দাসের পদে ধ্বনির দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পাষাণ মিলিয়া যায় গায়ের বাতাসে' এই ছত্রটি উদ্ধৃত করা চলে।

অনন্ত দাস ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম পদ-রচয়িতা। তাঁহার রচিত পদের স্থানে স্থানে পূর্ব্বগামী কবিগণের প্রভাব সুস্পষ্ট, তথাপি ইনি অনুকারী নহেন, যথার্থ স্রষ্টা। ইনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অবশ্য, বাংলা ভাষায়ও তিনি কতিপয় পদ রচনা করিয়াছেন, অন্ততঃ 'অনন্ত দাসের' ভণিতাযুক্ত পদাবলী হইতে এইরূপই অনুমান হয়। তাঁহার রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিতে 'ভক্তিবিলসিত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসের' পরিচয় পাওয়া যায়। (গৌর-পদ-তরঙ্গিণী দ্রষ্টব্য।) একদিকে ভাবোল্লাস ও মিলন, এবং অপর দিকে অভিসার-উল্লাসের পদ রচনা করিয়া কবি অনন্ত দাস কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। অনন্ত দাসের একটি প্রসিদ্ধ মিলনের পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

'রজনীক আনন্দ কি কহব তোয়।
চির দিনে মাধব মিলল মোয়॥
হিয়ায় হইতে মোরে না করে বাহির।
হেরইতে বদন নয়নে বহে নীর।
দারিদ্র হেম জনু তিলেক না ছোড়।
ঐছন হাম রহলু পিয়া কোর॥
যতহুঁ বিপদ কছু না কহলু রোয়।
কহইতে কৈছে কি জানি কিয়ে হোয়॥
নাগর গর গর আরতি বিথার।
দাস অনন্ত কহ ইহ রস সার'॥

অনন্ত, অনন্ত আচার্য্য, অনন্ত রায়, অনন্ত দাস প্রভৃতি ভণিতা দর্শনে মনে হয়, 'অনন্ত' নামধারী কতিপয় পদকর্ত্তা পদ রচনা

করিয়াছেন। অনন্ত দাসের রচিত একটি প্রসিদ্ধ ব্রজবুলি পদে অপূর্ব্ব সংগীত-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-তরঙ্গ লক্ষণীয়, যথা—

'বিকচ সরোজ- ভান মুখমণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু-মাধুরী হাস উগারই
পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর'॥ ইত্যাদি

'চৈতন্যমঙ্গলের' রচয়িতা এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য লোচনদাসও একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিদগ্ধ শব্দশিল্পী, অনেক সময়ে তিনি সযত্নে শ্রবণ-সুভগ শব্দের মাল্য গ্রথিত করিয়াছেন। তবে 'গৌর-নাগরী' ভাবের উপাসক ছিলেন বলিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তিনি তেমন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় বলেন—'ভাবানুবাদে লোচনের ন্যায় নিপুণ কবি বাংলা সাহিত্যে অতি অল্পই আছেন।' ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি রায় রামানন্দ-কৃত সংস্কৃত শ্লোক ও সেই সঙ্গে লোচনের ভাবানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা লোচনের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অনুবাদটি উদ্ধৃত করিলাম—

'চললি ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জর-বর-গমনী।
কেলি-বিপিনে সাজলি রঙ্গে রঙ্গে বরজ-রমণী॥
মদন আতঙ্গে পুলক অঙ্গ, নব অনুরাগে প্রেম-তরঙ্গ,
চঞ্চল-মৃগ-নয়নী।
কবরীমণ্ডিত মালতীমাল নবজলধর-তড়িত জাল
স্থগিত চকিত অমনি।

বদনমণ্ডল শরদচন্দ্র,
মদনের মনে লাগল ধন্দ
নিখিল-ভুবন-মোহিনী ।

নীলবসন রতনভূষণ,
মণিময় হার দোলায় সঘন
কটিতটে বাজে কিঙ্কিণী ।

চরণ-কমলে মাতল ভৃঙ্গ,
মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ
সদা করে গুনগুন্ ধ্বনি ॥

চকিত যুগল নয়নপদ্ম,
খঞ্জন-মনে লাগল ধন্দ
চম্পক-কাঞ্চন-বরণী ॥

হেলিয়া দুলিয়া যখনি রঙ্গে
নব নব নব নাগরী সঙ্গে
লোচন-মন-রঞ্জনী' ॥

শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক পদ-রচনায় নয়নানন্দ মিশ্র বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত পদ 'গৌরপদতরঙ্গিণীতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। একদিকে দুর্লভ কবিত্ব-শক্তি, অপর দিকে আন্তরিকতা ইঁহার পদগুলিকে বিশেষ উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

জগন্নাথ দাসের পদেও শব্দচয়ন-কৌশল ও লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে নরোত্তম দাস ঠাকুরের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার রচিত প্রার্থনার পদগুলিতে যে দৈন্য ও আর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমাদিগকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম, দার্শনিক-প্রবর শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভে ধন্য লোকনাথ

গোস্বামীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। লোকনাথ নরোত্তমকে বলিয়াছিলেন—

'প্রেমরূপে আপনে চৈতন্য ভগবান'।
সেই প্রেম তোমার হৃদয়ে কৈল দান'॥ (প্রেমবিলাস)

ভাগ্যবান নরোত্তম শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দেরও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন।

নরোত্তম বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে নূতন প্রাণ-সঞ্চার করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

নরোত্তম তাঁহার জন্মস্থান 'খেতুরীতে' ছয়টি দেব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে খেতুরীতে যে মহোৎসব হইয়াছিল, তাহাতেই রস-কীর্ত্তনের সৃষ্টি ও সম্ভবতঃ 'গৌরচন্দ্রিকার' প্রবর্ত্তন হয়।

নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনার পদ-সম্পর্কে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন—'প্রার্থনাগুলির জন্যই নরোত্তম সাহিত্য-জগতে ও বৈষ্ণব-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফলতঃ, এরূপ প্রাণস্পর্শী, হৃদয়-দ্রবকারী, চিত্ত-উন্নতকারী প্রার্থনা জগতের আর কোন ভাষায় ও কোন ধর্ম্মে আছে কিনা, সন্দেহ'। নরোত্তমের একটি বিখ্যাত প্রার্থনার পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝিব সে যুগল-পিরীতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস'॥

নরোত্তমের প্রত্যেকটি প্রার্থনার পদেই ভক্ত-হৃদয়ের বিগলিত অশ্রু যেন শুভ্র, সংহত মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। এই পদগুলিতে মানুষ নরোত্তমের যে আন্তরিকতার পরিচয় রহিয়াছে, ভক্তি-ভাবিত হৃদয়ের যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস রহিয়াছে, উহা আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

রাধাকৃষ্ণের লীলা-অবলম্বনেও নরোত্তম অনেক পদ রচনা করিয়াছেন।

নরোত্তমের 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার' সর্ব্বজনীন আবেদন-সম্পর্কে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

'আমাদের বিবেচনায় কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—সকল সম্প্রদায়ের আস্তিক পাঠকদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উপাদেয় ও সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এই গ্রন্থের অনেক সূক্তি প্রবচনরূপে বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ সূক্তিগুলিতে যথার্থই সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার সঞ্চিত রহিয়াছে'।

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস কবিরাজ ভিন্ন গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য্য ও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে আরও তিনজন পদকর্ত্তা

ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদরচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচিত 'রাধা-বিরহের' পদের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

'পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া'॥

ইত্যাদি।

অনেকের ধারণা, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত বহু পদ গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে ভক্তি-রত্নাকরে লিখিত আছে—

'আচার্য্যের অতিপ্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী।
গীত-বাদ্য-বিদ্যায় নিপুণ ভক্তি মূর্ত্তি॥

তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের 'গুরুভাই' ছিলেন এবং কবিরাজের সমকক্ষ না হইলেও একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কোন্ পদগুলির রচয়িতা, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

শ্রীখণ্ডের 'কবিরঞ্জন' ষোড়শ শতকের অন্যতম পদকর্ত্তা। ইনিও বিদ্যাপতি নামে পরিচিত। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ইঁহার রচিত অনেক পদ মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর পদকর্ত্তাদের মধ্যে রায় বসন্তের নাম উল্লেখযোগ্য। রূপবর্ণনায় রায় বসন্ত চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি চারিটি হইতেই আমরা রায় বসন্তের হিল্লোলিত ছন্দের পরিচয় পাইব।

'এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীতবসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রঞ্জিত অঙ্গ।
কনক-হার হিয়ে বিজুরী-তরঙ্গ'॥

রায় বসন্তের রচিত এইরূপ আরও অনেক পদ উদ্ধৃত করা যায়।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী ও বিদগ্ধ মহাজন রায় শেখর। ইনি কবি-শেখর বা শেখর নামেও পরিচিত। ইনি বহু পদ রচনা করিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ ইঁহার রচিত কয়েকটি পদ মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রায় শেখর যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ন্যায় দুর্লভ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি অভিসারের পদ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

'গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ-পতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার'॥

উদ্ধৃত পদটির মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

(ক) শব্দচিত্র-অঙ্কনে ও ভাব-প্রকাশক যথাযথ শব্দ-নির্ব্বাচনে কবির অসাধারণ চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির যে অনির্ব্বচনীয় ভাব-প্রকাশের শক্তি রহিয়াছে, সে সম্পর্কেও কবি সচেতন ছিলেন।

(খ) অভিসারের পট-ভূমিকা হিসাবেই কবি বর্ষা ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন ; তাই কোথাও বর্ণনার বাহুল্য নাই, অথচ কবির লিপিকুশলতার গুণে ঘনবর্ষার একখানি চিত্র যেন আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে।

(গ) শ্রীরাধার হৃদয়ের আর্ত্তি স্বল্প কথায় চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, যথা—'শ্যাম নাগর একলি কৈছনে পন্থ হেরই মোর'।

(ঘ) স্বল্পাক্ষরে গভীর ভাব-প্রকাশের নৈপুণ্য উদ্ধৃত পদটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুলা অভিসারিকা রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—'জীবন মঝু আগুসার'। এই কথা কয়টি গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ। রাধিকা বলিতেছেন—আমার জীবন (অর্থাৎ জীবন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ) সঙ্কেত-কুঞ্জে পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছেন, সুতরাং আমাকে অভিসারে যাত্রা করিতেই হইবে। কিন্তু রাধিকার উক্তিটির মধ্যে আর একটি গভীর অর্থও নিহিত আছে। তিনি বলিতেছেন,—আমার দেহটিকেই এখানে দেখিতে পাইতেছ কিন্তু আমার জীবন (অর্থাৎ চৈতন্যময় সত্তা) চলিয়া গিয়াছে সেই কুঞ্জে যেখানে আমার কান্ত বর্ত্তমান।

(ঙ) ভণিতায় পদকর্ত্তা যে কথা বলিয়াছেন, তাহাও বিশেষ ইঙ্গিত-পূর্ণ। অভিসারিকার নিকট দুস্তর বিঘ্নরাশিও বিঘ্ন বলিয়া মনে হয় না, প্রতীক্ষমাণ কান্তের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তিনি এমনই ব্যাকুল হন যে, পথের সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাই পদকর্ত্তা যেন রাধিকার মনের কথাই বলিতেছেন,—'কিয়ে সে বিঘিনি বিথার'।

'এ সখি হামারি দুঃখের নাহিক ওর'—মাথুরের একটি প্রসিদ্ধ পদ। পদটি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রচলিত পদের শেষ পংক্তিগুলি এইরূপ—

'তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

কিন্তু পদরত্নাকরে উদ্ধৃত পদটিতে শেখরের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

'তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
ভণয়ে শেখর কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া'॥

অনেকে কবিশেখরকে এই পদটির রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা মনে করেন, এই পদটি যদি অন্য কোন মহাজনের রচিত হয়, তাহা হইলে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির গৌরব অনেকখানি ম্লান হইয়া যায়। আবার, কেহ কেহ মনে করেন, অর্থসঙ্গতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে 'কৈছে নিরবহ সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া'—এই পদটিই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া কষ্টকর। বিদ্যাপতির ভণিতা-যুক্ত পদে যেটুকু অসঙ্গতি দেখা যায়, তাহা ভাবগ্রাহী রসিকের দৃষ্টিতে অসঙ্গতি বলিয়াই মনে হইবে না। আবার রায় শেখরের ন্যায় প্রতিভাবান্ মহাজন যে এই পদটির রচয়িতা হইতে পারেন না, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে কোন্‌গুলি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত, সে বিষয়ে আমরা আজও নিঃসংশয় হইতে পারি নাই।

আমরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদের সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। এই শতকে আরও অজস্র পদ-রচয়িতার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল যাঁহাদের রচনায় তেমন কিছু

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। সপ্তদশ শতকের পূর্ব্বে বাংলায় ধর্ম্ম-সম্পর্ক-শূন্য লৌকিক সাহিত্যের উদ্ভব হয় নাই। ষোড়শ শতকে একদিকে যেমন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বাংলার লৌকিক ধর্ম্মের পরিচয় পাই, অপর দিকে তেমনি পদাবলী-সাহিত্যে চৈতন্যোত্তর মহাজনগণের বিশিষ্ট সাধনা ও ভাবদৃষ্টির পরিচয় পাই। পদাবলী-সাহিত্যকে মহাজনগণের সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে এবং শুধু সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য বিচার করিলে পদকর্ত্তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। তথাপি একথাও সত্য যে, এই যুগে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্ময়কর ও অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল এবং যুগপৎ এমন বহু পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও প্রেমের এক অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এইজন্যই ইঁহারা শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া পদ রচনা করিলেও প্রতিভার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলার স্বভাব-কোমল মৃত্তিকা মহাপ্রভুর অশ্রু-মন্দাকিনীর প্লাবনে দ্রবীভূত হওয়াতে যে পলিমাটির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে যেমন অজস্র বনস্পতির আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনই বহু ফলপাকান্তা ওষধিরও জন্ম হইয়াছিল।—আর্ষ রামায়ণ বা মহাভারত যেমন বহু ভারতীয় কবির কাব্য-রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তেমনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লোকোত্তর জীবনও অগণিত পরিকর ও ভক্তগণের মনে সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনকে মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থবাদী।

ষোড়শ শতকের মঙ্গলকাব্য

আমরা বলিয়াছি, ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য প্রধানত তিনটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল--বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা, ভারত-পাঁচালির ধারা ও মঙ্গল-কাব্যের ধারা। এই শতকের সার্থক সাহিত্যিক প্রচেষ্টা-হিসাবে বিপুলায়তন ও নানা ধারায় বিভক্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের পরেই মঙ্গল-কাব্যের কথা উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের প্রতিভার স্পর্শেই মঙ্গলকাব্য সর্ব্ব প্রথম সাহিত্যিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম উভয়েই জীবন-রসের রসিক হইলেও মুকুন্দরাম ছিলেন মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে প্রথম যথার্থ শিল্পী ; সুতরাং, মাধবের কাব্যের মধ্যে যেখানে রূঢ়তা ছিল, মুকুন্দরাম সেখানে শিল্প-সুষমার অবতারণা করিয়াছেন। মনে হয়, মুকুন্দরামের কাব্য রচিত ও জনসমাজে প্রচারিত হইলে মাধবের কবি-যশ অনেকটা ম্লান হইয়া পড়ে।

চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের মনে চণ্ডীপূজার উদ্ভব-সম্পর্কে কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিত-সমাজে মতের অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

দ্বিজ মাধবের রচিত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্যের মতে বাংলার মঙ্গল-চণ্ডী একটি 'মিশ্র দেবতা'। মঙ্গল-চণ্ডীর পরিকল্পনায় একদিকে যেমন মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী উমার প্রভাব আছে, অপর দিকে তেমনি দানব-নাশিনী

চণ্ডিকারও প্রভাব আছে। সম্পাদক মহাশয়ের মতে 'মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে সরস্বতী, মহিষমর্দ্দিনী, চণ্ডী, লক্ষ্মী ও উমার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এই দেবী শুধু চণ্ডী অর্থাৎ কোপনস্বভাবা বা উগ্রা নহেন, তিনি মঙ্গলা অর্থাৎ কল্যাণময়ীও বটেন। তিনি ভক্তগণের নিকট বরাভয়দাত্রী, কিন্তু অধার্ম্মিকের চক্ষে তিনি ভীষণা। সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন, বৃহন্নীলতন্ত্রে এবং কালিকাপুরাণেও মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ওরাওঁগণের দেবী 'চান্দী'ই যে বাংলা দেশে মঙ্গলচণ্ডীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন, এ কথা প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং মঙ্গলচণ্ডীর পরিকল্পনায় যে অনার্য্য প্রভাব রহিয়াছে অথবা মঙ্গলচণ্ডী যে পুরাণ-তন্ত্র-বহির্ভূত লৌকিক দেবতামাত্র, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

তবে, মঙ্গলচণ্ডীর পরিকল্পনায় যে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছুটা প্রভাব আছে, এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। 'ভূমিকায়' তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

'বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিত দ্বিবিধ মূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য ঐশ্বর্য্য-বর্জ্জিত, চির-মধুর, বর্হ-স্ফুরিত-রুচি, গোপ-বেশধারী কৃষ্ণকেই আরাধনা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের রচনাতেও মঙ্গলচণ্ডী-চরিত্রের শান্ত ভাবই প্রাধান্য লাভ করে'।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' লৌকিক চণ্ডীপূজার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। নানা যুক্তির সাহায্যে

তিনি এই কথা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, মঙ্গলচণ্ডী মূলত ছিলেন আর্য্যেতর সমাজের দেবতা, ওরাওঁ সমাজের চাণ্ডীই কালক্রমে মঙ্গলচণ্ডীতে রূপান্তরিত ও পৌরাণিক দেবতারূপে গৃহীত হইয়াছিল। এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে মঙ্গলচণ্ডী নামের ব্যাখ্যা ও তাঁহার ধ্যানের মন্ত্র পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত চণ্ডীর সম্পর্ক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে মঙ্গলচণ্ডী মূলত অনার্য্য দেবতা, তবে পরবর্ত্তী কালে তিনি পৌরাণিক দেবীতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন, আর শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্যের মতে মঙ্গলচণ্ডী মূলত পৌরাণিক মিশ্র দেবতা,—তাঁহার পরিকল্পনার মূলে কোন অনার্য্য প্রভাব রহিয়াছে, এরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত উপকরণের অভাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য শুধু চণ্ডীপূজার উদ্ভব-সম্পর্কে।

আমরা এখানে এই জটিল প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও অনেক আলোক-সম্পাত হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা শুধু এই বলিতে পারি যে চণ্ডীপূজার উদ্ভব-সম্পর্কে কোন মতবাদই (Hypothesis) প্রমাণিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের লেখক দ্বিজ মাধব ও চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা দ্বিজ মাধব ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতেই জানা যায়, দ্বিজ মাধব ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রন্থ

রচনা করেন। (১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।) দ্বিজ মাধবের কবিত্ব-শক্তি মুকুন্দরামের অপেক্ষা হীন হইলেও তিনিই সর্ব্বপ্রথম মঙ্গল কাব্যে সাহিত্যিক রস সঞ্চার করিতে সমর্থ হন।

দ্বিজ মাধবের কাব্যে যে সমস্ত গুণ সহজেই চোখে পড়ে তাহা হইতেছে—চরিত্রাঙ্কনে দক্ষতা, বর্ণনীয় বিষয়ের প্রতি কবির গভীর সহানুভূতি, বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে নিপুণতা এবং বর্ণনার সহজতা। দ্বিজ মাধব মুকুন্দরামের মত ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন কি না, জানিনা; কিন্তু লেখকের সহানুভূতির গুণে দুঃখের বর্ণনা মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন,—'দ্বিজ মাধবের অন্যতম প্রধান গুণ, তিনি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্র বাস্তব পটভূমিকার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গার্হস্থ্য চিত্র বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন।'

দ্বিজ মাধবের কবিত্ব-শক্তির কিছু পরিচয় দিব। কালকেতুর বিক্রম বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

'বাড়ে বীরবর করিবর জিনি কর
গজশুণ্ড ধরে বাম করে।
যথেক আক্ষটি সুত তারা সব পরাভূত
খেলায়ে জিনিতে নাহি পারে॥
বাটুল বাঁশ লইয়া করে পক্ষী বধিবার তরে
তার ঘাও ব্যর্থ নাহি যায়ে।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি থাকিয়া মারয়ে পাখী
ঘুমি ঘুমি পড়ে ঠায়ে ঠায়ে॥

পক্ষী বধি হস্ত স্থির　　　　　　　　সমরে গম্ভীর ধীর
গণ্ডী শর লইয়া বাম করে।
কাচনি করিয়া বাণ　　　　　　　　অতি বড় খরশাণ
চলি যায়ে জনক দোসরে॥
অম্বর বান্ধিয়া গলে　　　　　　　　করযোড় করি বোলে
শুন বাপ আমার বচন।
তুহ্মি থাকহ ঘরে　　　　　　　　গণ্ডী শর দেহ মোরে
নিত্য বধিমু পশুগণ'॥

এই বর্ণনাটি শুধু উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারেই সমৃদ্ধ নহে, ইহার মধ্য দিয়া বীর কালকেতুর মূর্ত্তিটি পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত মুকুন্দরামের 'কালকেতুর বিক্রম-বর্ণনার' তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, দ্বিজ মাধবের বর্ণনা মুকুন্দরামের উপজীব্য হইলেও তিনি শুধু অনুকারী নহেন, স্রষ্টাও বটেন; তাই তাঁহার বর্ণনাটি অধিকতর কবিত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

দ্বিজ মাধব এই ভাবে ফুল্লরার বারমাসী দুঃখের বর্ণনা করিতেছেন—

'মাধবেতে দুঃখের কথা শুনহ যুবতী।
যথ দুঃখে ব্যাধের ঘরে করিয়ে বসতি॥
প্রাতঃকাল প্রভু মোর যায়ে বনবাস।
যে দিনে না মিলে পশু থাকি উপবাস॥

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে রামা শুন মোর দুঃখ।
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক॥

প্রচণ্ড রবির তাপ দহে কলেবর।
ললাটের ঘর্ম্ম মোর পড়ে পদতল॥
আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।
ক্ষুধায়ে আকুল হই লোটাই আমি ক্ষিতি॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠি আমি চারিদিকে চাহি।
হেন সাধ করে মনে অন্য জাতি যাই॥
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থুইতে ঠাঁই নাই ঘরে আঠু পানি॥
শীতের কারণে ঘরে বেড়াই চারি কোণে।
মানের পাত মুণ্ডে দিয়া বঞ্চি দুই জনে॥
ভাদ্র মাসেতে রামা বিদ্যুৎ-ঝঙ্কার।
হেনকালে চলি আমি মাথায় পসার॥
নয়ানেতে পানি দিয়া নদী হই পার।
বিষাদ ভাবিয়া স্মরি সূর্য্যের কুমার॥
আশ্বিন মাসেতে রামা জগৎ সুখময়।
দুর্গার আনন্দ-হেতু নাহি চিন্তা ভয়॥
বীণা বাঁশী বাহে কেহ লোকে গায়ে গীত।
অন্নের কারণে প্রভু সদায়ে কুঞ্চিত॥
গিরি-সুতা-সুত মাসে শুন মোর দুঃখ।
পাড়া-পড়শী নাহি বোলাইতে সম্মুখ॥
উঠিয়া দাঁড়াইতে নারি গায়ে নাই বল।
ক্ষুধায়ে আকুল হই খাই বনফল॥
অঘ্রাণ মাসেতে কৈন্যা শীত পড়ে বেশ।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হইল শেষ॥

মৃগচর্ম্ম ওড়ন মৃগচর্ম্ম পরিধান।
শীতে কাম্পিয়া রাত্র বঞ্চি দুই জন ॥
পৌষ মাসেতে রামা হেমন্ত প্রবল।
শীত ভয়ে সদায়ে মোর কম্পিত কলেবর ॥
অধর যে অঙ্গ মোর কম্পিত সঘন।
অরণ্যের কাষ্ঠ আনি পোহাই হুতাশন ॥
মাঘ মাসেতে কৈন্যা গোরুয়া লাগে শীত।
লোমে লোমে বিন্ধে মোর শোষয়ে শোণিত ॥
খইয়া পাতিয়া থাকি বিভাবরী কালে।
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবির জালে ॥
ফাল্গুন মাসেতে সাজি আইল ঋতুবতী।
নিজ পরিবার লইয়া সখার সঙ্গতি ॥
কামিনী করয়ে কেলি সখা লইয়া পাশে।
হেন কালে যায় স্বামী বন-পরবাসে ॥
মধু মাসেতে কৈন্যা শুন মোর কথা।
রবির উত্তাপে মোর ঠেকি রহে মাথা ॥
মোর ক্লেশ দেখি দুঃখিত বীরমণি।
অন্তরে নাহিক সুখ না চাহে কামিনী ॥'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি হইতে দ্বিজ মাধবের স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। মুকুন্দরামের 'ফুল্লরার বারমাস্যা' সর্ব্বজন-পরিচিত ;—তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে এই বর্ণনাটি কেমন শিল্প-সুষমা-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে সে কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

কোন কোন স্থলে স্বাভাবিকতায় দ্বিজ মাধব মুকুন্দরামকেও

অতিক্রম করিয়াছেন। ফুল্লরা যখন শুনিতে পাইলেন, কলিঙ্গরাজ-সৈন্য পরাজিত হইয়াও পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন তাহার শঙ্কাকুল হৃদয়ের আর্ত্তি উভয় কবির কাব্যেই ফুল্লরার উপদেশের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরামের ফুল্লরা রামায়ণের বালিবধের কাহিনীর উল্লেখ করিয়া স্বামীকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিয়াছেন, আর মুকুন্দরামের কালকেতু 'ধান্য-ঘরে লুকাইয়া' কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে ব্যাধ-দম্পতীর চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এরূপ স্থলে দ্বিজ মাধবের ফুল্লরার উপদেশে বৈদগ্ধের পরিচয় নাই, আর কালকেতুর আচরণও সম্পূর্ণ বীরোচিত হইয়াছে।

মুকুন্দরাম যেন কথা-সাহিত্যিকের প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কথা-সাহিত্যিকের মতই তিনি চরিত্র-সৃষ্টিতে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যে কালকেতুর উপাখ্যানে কালকেতু একদিকে দুর্জ্জয় শক্তি ও সাহস এবং অপর দিকে দুর্ল্ভ চরিত্রবলের অধিকারী ; আবার আদর্শ গৃহিণী ফুল্লরা দারুণ দুঃখদৈন্যের মধ্যেও কখনও চিত্তের প্রশান্তি হারায় নাই এবং সর্ব্বদা পতিপ্রেমে অবিচল রহিয়াছে। ধূর্ত্ততার প্রতিমূর্ত্তি ভাঁড়ু দত্ত শুধু সেকালের নয়, সর্ব্ব কালেরই এক শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি। তাঁহার সম্বল ছিল দুর্জ্জয় জাত্যভিমান ও দুর্দ্দমনীয় ঈর্ষ্যা। সে সাময়িকভাবে কালকেতুর লাঞ্ছনা ও দুর্গতির কারণ হইয়াছে সত্য কিন্তু পরিণামে ধার্ম্মিক কালকেতুরই জয় হইয়াছে।

ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে ধনপতি ও শ্রীমন্তের এবং লহনা ও খুল্লনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। ঈর্ষ্যাপরায়ণা দুর্ব্বলা দাসী সপত্নীদ্বয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে,—তাই দুর্ব্বলা দাসীও এক শ্রেণীর নারীর প্রতিনিধি। ধনপতির কাহিনীর মধ্য দিয়া সে যুগের সমাজ ও সমাজপতিগণের রূপটিই যেন আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠিয়াছে। ফুল্লররার চরিত্রে আমরা সতীত্বের দৃপ্ত তেজ ও মহিমা দেখিতে পাইয়াছি।

আবার, কালকেতুর উপাখ্যানে মুরারি শীলের চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্রটির পরিকল্পনার জন্য মুকুন্দরাম কোন পূর্ব্বগামী কবির নিকট ঋণী নহেন। ভাঁড়ু দত্তের ন্যায় মুরারি শীলও আমাদের পরিচিত। সে ধূর্ত্ত, অর্থলোভী, স্বার্থান্বেষী, প্রত্যুৎপন্নমতি, তাহার 'সহধর্ম্মিণীটি'ও চাতুর্য্যে বড় কম নহেন।

বাস্তবিক, মুকুন্দরাম ছিলেন জীবন-রস-রসিক, তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ছিল নিপুণ, সহানুভূতি ছিল গভীর, কাহিনীর পরিকল্পনায় তিনি পূর্ব্বগামী কবিদের নিকট ঋণী হইলেও নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহার মধ্যে নূতন রস সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—'মানব-চরিত্র-সম্পর্কে মুকুন্দরামের যে সুগভীর ও সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অভিনব।...কবির ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-বেদনা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যথার্থ রূপ লাভ করিয়াও তাহা যে সর্ব্বজনীন হইয়া

উঠিতে পারে, বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামই তাহা সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন।' শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুন্দরাম-সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।' (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।)

মুকুন্দরামের কাব্য শুধু কাব্য-রসিকের চোখে নহে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও এক পরম মূল্যবান সম্পদ। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার চিত্রাঙ্কনে মুকুন্দরাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও মুকুন্দরামের কাব্যের intense reality ও fidelity-র উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলার সামাজিক জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থা-সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে মুকুন্দরামের কাব্যখানি অপরিহার্য্য। মুকুন্দরাম সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, জেলে, কলু, বাগ্‌দি, ছুতার, ধোপা, দরজি, পাটনি প্রত্যেকেই যে সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ, কেউ যে হীন, অস্পৃশ্য বা পতিত নয়,—এই সত্য উপলব্ধি করিবার মত উদার দৃষ্টিভঙ্গী মুকুন্দরামের ছিল। নির্য্যাতিত মানুষের প্রতিও মুকুন্দরামের গভীর সমবেদনা ছিল। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—নির্য্যাতিত পশুকুলের ভিতর দিয়া কবি অত্যাচারিত সমাজেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন'। কবি মুসলমান-সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহারও মূলে রহিয়াছে কবির নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও সহানুভূতি।

কবি হর-পার্ব্বতীর দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে পৌরাণিক শিব ও গৌরীর মহিমা ক্ষুণ্ণ হইলেও দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থের দাম্পত্য জীবনের ক্ষোভ ও অভিমানে-ভরা মাধুর্য্যই যেন রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র শিবের বিশ্রাম-স্পৃহা ও ভোজন-লালসা এবং সংসার-সম্পর্কে অজ্ঞতা, আশাহত শিবের গৃহত্যাগ এবং অভিমানিনী গৌরীর পিতৃগৃহে যাত্রা—এই সকল কাহিনীর মধ্য দিয়া দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে। লহনা ও খুল্লনার কলহের মধ্যে বা সপত্নীর অমঙ্গল-সাধনের উদ্দেশ্যে লহনার মন্ত্রপূত ঔষধ-প্রয়োগের মধ্যে সে কালের বাঙ্গালী গৃহের বাস্তব রূপটি প্রতিফলিত হইয়াছে। কালকেতুর উপাখ্যানে চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ—

'সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে করি বিষ পান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতীনের কিবা হবে হানি'।

অথবা সপত্নীর দ্বন্দ্বের বর্ণনা উপলক্ষ্যে কবির উক্তি—

'এক জন সহিলে কোন্দল হয় দূর'

কবির সাংসারিক অভিজ্ঞতারই পরিচয় বহন করিতেছে। কবির আর একটি অনুরূপ উক্তি প্রায় প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে—

'শাশুড়ী ননদ নাই, নাই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কইলি রাতা'॥

আবার মুকুন্দরাম খুল্লনার রন্ধনের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে সেকালের ধনিগৃহে উৎসব-উপলক্ষ্যে যে বিচিত্র ভোজ্য-দ্রব্যের আয়োজন হইত, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিবরণী হইতে বুঝিতে পারি, বাঙ্গালী ভোজন-বিলাসী হইলেও 'মুসলমানী খানা' তখন তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই। *মুকুন্দরাম যে স্বয়ং রন্ধনে নিপুণ ছিলেন, এই বর্ণনা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

'প্রভুর আদেশ ধরি, রান্ধয়ে খুল্লনা নারী,
সোঙারিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘৃত লবণ ঝাল, আদি নানা বস্তুজাল
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥

বাইগুণ কুমড়া, কড়া, কাঁচকলা দিয়া শাড়া,
বেসার পিঠালী ঘন কাঠি।
ঘৃতে সন্তোলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি,
শুক্তা রন্ধন পরিপাটি।
ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি, নৈটা শাকে ফুল বড়ি,
চিঙ্গড়ি কাঁঠাল-বীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্তূক পাক
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥

দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড
সন্তোলিল মহুরীর বাসে।

---

* চন্দ্রনাথ বসুর 'সংযম-শিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

মুগ সূপে ইক্ষুরস, কৈ ভাজে পণ দশ
মরিচ গুঁড়িয়া আদা রসে।
মসূরী মিশ্রিত মাস, সূপ রান্ধে রসবাস
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।
রান্ধে চিথলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল
মান বড়ি মরিচে ভূষিত॥

বোদালি হেলেঞ্চা শাক, কাঠি দিয়া কৈল পাক,
ঘন বেসার সন্তোলন তৈলে।
কিছু ভাজে রাই খড়া, চিঙ্গুড়ির তোলে বড়া,
খরসোলা পুজী দশ তোলে॥

করিয়া কণ্টকহীন আম্রে শকুল মীন,
খর লোণ দিয়া ঘন কাঠি।
রান্ধিল পাঁকাল ঝষ দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাঁটি॥

কলা বড়া মুগসাউলী ক্ষীর-মোননা ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রান্ধে অবশেষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে॥

এই বর্ণনা হইতে এ কথাও মনে হয় যে, মুকুন্দরাম সম্ভবত বৈষ্ণব ছিলেন না, কারণ, সেকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত কোন ব্যক্তির পক্ষে হয়তো আমিষ-রন্ধনের বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না। কবির নিজের উক্তি হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন এবং আমিষাহার বর্জ্জন করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু কবি নিজের ধর্ম্মমত-সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। তাই এ বিষয়ে পণ্ডিত-সমাজে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু মুকুন্দরাম বৈষ্ণব হউন অথবা পঞ্চোপাসক হউন অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত হউন, মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্ম যে তাঁহার মনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। চৈতন্য-বন্দনায় কবি বলিয়াছেন—

'অবনীতে অবতরি চৈতন্যরূপেতে হরি
বন্দিব সন্ন্যাসি-চূড়ামণি।
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ-কন্দ
মুকতির দেখাল সরণি'॥

মুকুন্দরামের কাব্যে যে উদার, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারও মূলে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রভাব আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আর এরূপ অনুমান করিবার সঙ্গত কারণও আছে। সে যুগে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের মহাপ্লাবন হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করা বোধ হয় কোন কবির পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে ধর্ম্মসম্পর্ক-বর্জ্জিত লৌকিক আখ্যান-কাব্যের উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীর প্রচলিত কাহিনীর অনুসরণ করিয়াও মুকুন্দরাম চরিত্র-সৃষ্টিতে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

হাস্যরসের অবতারণায়ও মুকুন্দরাম দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিদগ্ধ শিল্পী হইলেও তাঁহার রচনা কোথাও পাণ্ডিত্যের

দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই। মুকুন্দরামের রচনায় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের ন্যায় কোন সূক্ষ্ম বা গভীর অধ্যাত্ম ভাবের ব্যঞ্জনা নাই, কারণ, তিনি ছিলেন 'জীবন-রস-রসিক কবি'। তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ও বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগিনী, তাঁহার চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়।

মুকুন্দরাম সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষ দশকে (১৫৯৪—১৬০০) তাঁহার কাব্যখানি রচনা করেন। সুতরাং দ্বিজ মাধবের কাব্যখানি রচিত হইবার কয়েক বৎসর পরেই মুকুন্দরামের কাব্যখানি রচিত হয়।

মুকুন্দরাম আমাদের চিরপরিচিত গৃহের পরিবেশ হইতে রস আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। তিনি কখনও কল্পনার পক্ষে ভর করিয়া আকাশ-মার্গে বিচরণ করেন নাই।

তিনি মানব-জীবনের সুখদুঃখ উভয়কেই সমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার মনে কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মুকুন্দরাম যে যুগের লোক, সে যুগে বাঙ্গালীর জীবনে দুঃখদৈন্য ছিল কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারের ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের স্নেহ-প্রীতি লাভে ধন্য হইয়া দুঃখের মধ্যেও সে যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করিত। দেবতার প্রতি অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাস সে যুগের বাঙ্গালীর ছিল সহজাত, এইজন্য দারুণ দুঃখেও সে আত্মহারা হইত না। মুকুন্দরাম সেই যুগেরই ভক্ত কবি ও বিদগ্ধ শিল্পী,—স্বয়ং দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া এবং পরিশেষে রাজার

আশ্রয় লাভ করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা তাঁহার স্বাভাবিক কবি-প্রতিভার সহিত মিলিত হওয়াতে তাঁহার রচিত কাব্যখানি এমন হৃদয়-গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয় ও আত্মোপলব্ধির যুগ। এই যুগে বাঙ্গালী যে নব-চেতনা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে তাহার সাহিত্য ও জীবন অভাবনীয় ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছিল, সে সৃষ্টির প্রাচুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু মহাভাবের প্লাবনের এই যুগে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারাও বিলুপ্ত হয় নাই, বরং ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই এই যুগেই মঙ্গলকাব্য সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সমগ্র দেশের মধ্যে যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র জাতির চিত্তভূমি স্নিগ্ধ ও সরস হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষ আর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দৈবাধীন মনে করে নাই, সে আপন মহিমা-সম্পর্কে সচেতন হইয়াছিল। ষোড়শ শতকের মঙ্গল-কাব্যেই সর্ব্বপ্রথম এই নূতন ভাব-দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়।